জলপুত্র

হরিশংকর জলদাস

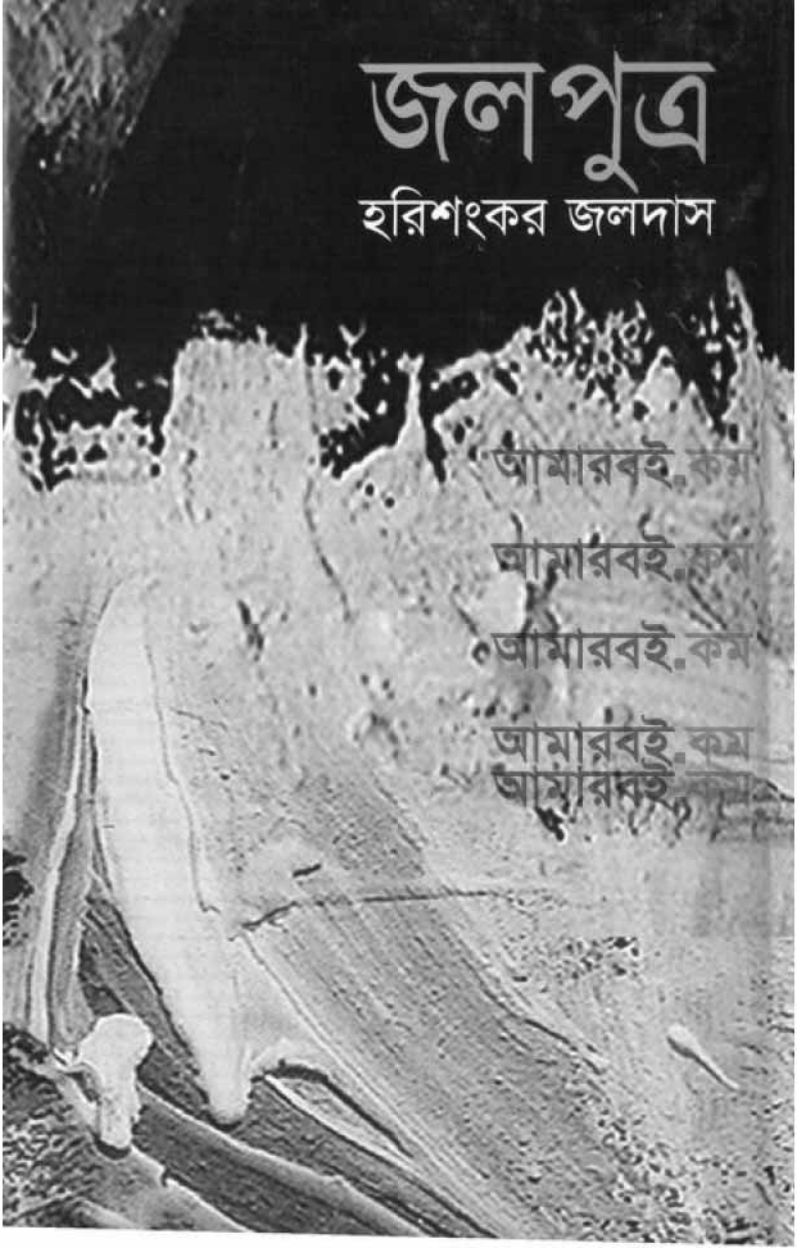

আমারবই.কম
আমারবই.কম
আমারবই.কম
আমারবই.কম
আমারবই.কম

জলপুত্র

হরিশংকর জলদাস

আমারবই.কম

আমারবই.কম

আমারবই.কম

আমারবই.কম
আমারবই.কম

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

উথালপাথাল বঙ্গোপসাগরের দিকে তাকিয়ে আছে উনিশ বছরের ভুবনেশ্বরী।

দু'চোখে ভীতি। সমস্তমুখে উৎকণ্ঠা। অন্য কোনোদিকে খেয়াল নেই তার। একধরনের ব্যাকুলতায় সে আচ্ছন্ন। তার অসহায় চোখ দুটো সাগরের বুকে কী যেন খুঁজে মরছে। তার দৃষ্টি খুঁজে ফিরছে ঢেউয়ের মাথায় কোনো নৌকার অস্তিত্ব। নির্দিষ্ট একটি নৌকার উপস্থিতিই কেবল তার দুর্ভাবনার অবসান ঘটাতে পারে।

গতরাতে আকাশ যখন আলকাতরার মতো মেঘে ঢাকা, বাতাস যখন উত্তেজিত, তখন তার স্বামী চন্দ্রমণি চারজন সঙ্গীর সঙ্গে মাছ ধরতে গেছে গভীর সমুদ্রে। ওই সময়েই যেতে হয়েছিল। তখন ছিল জোয়ার, জোয়ারের সময়েই জালে মাছ ধরা পড়ে বেশি। তাই চন্দ্রমণিরা ঝড়কে উপেক্ষা করে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু যখন ফিরে আসার কথা, তখন ফিরে আসেনি তারা; পরের দিনের সাঁঝবেলাতেও নয়।

ভুবনেশ্বরী সেই সকাল থেকে বসে আছে বেড়িবাঁধে। সূর্য ডুবে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। আঁধার ঘন হয়ে আসছে। ভুবনেশ্বরীর দৃষ্টি আঁধারের দেয়ালে বাধা পাচ্ছে। তবুও সে আকুল হয়ে দূরের সমুদ্রে তাকিয়ে আছে।

গতরাতে ঝড়জল ছিল। শেষরাতের দিকে বাতাসের গতি বেড়েছে, জলের তোড়ও। হয়তো এই ঝড়ো হাওয়ায় চন্দ্রমণিরা ভেসে গেছে দূরে কোথাও, হয়তো তাদের নৌকাটি ডুবেছে। নৌকা ডোবার কথা ভাবতেই শিউরে ওঠে ভুবনেশ্বরী। স্বামী নেই—একথা ভাবতেই ভীতি তাকে উন্মূল করে। স্বামী ছাড়া সে বড় অসহায়। স্বামী যদি না ফিরে, মা-গঙ্গা যদি তাকে ভোগে নেয়, তবে ভুবনেশ্বরীর জীবনে থই থই অন্ধকার নামবে।

শ্রাবণের সাঁঝ। অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। সেই কবে থেকে ভিজছে সে। পাহাড়প্রমাণ ঢেউ কূলে ত্রাস জাগাচ্ছে। এসব দিকে খেয়াল নেই ভুবনেশ্বরীর।

'মা, ঘরত্ যাইতা নো?' তিন বছরের গঙ্গাপদর ডাকে ভুবনেশ্বরীর সম্বিৎ ফিরে। চেয়ে দেখে, গঙ্গাপদ ভিজে একাকার। সাগরের ঝড়ো-বাতাসে কাঁপছে

সে। মায়ের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে গঙ্গা আবার বলে, 'চল ঘরত্ যাই মা। আঁর শীত গরার।'

'অ পুত, আর ইক্কিনি থক্কা।' পশ্চিমের বঙ্গোপসাগরের দিকে চোখ রেখে বলে ভুবনেশ্বরী। বৃষ্টির জলে এবং অশ্রুতে ভেজা চোখ তার।

গভীর রাত। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। পুকুর-খাল-বিল থেকে ব্যাঙের আওয়াজ ভেসে আসছে। চন্দ্রমণিরা ফিরেনি। ভুবনেশ্বরী উদ্‌ভ্রান্তভাবে বসে আছে ঘরে। গঙ্গাপদ গোটাদিনের ক্লান্তি নিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ভুবনেশ্বরীর চোখে ঘুম নেই। দরজা আধা খোলা। যদি চন্দ্রমণি ফিরে আসে ! বৃদ্ধ শ্বশুর ঘরে শুয়ে আছে, এককোনে। কিছুক্ষণ পর পর তেল চিটচিটে বালিশ থেকে মাথা তুলে জিজ্ঞেস করছে, 'অ বউ, চন্দ্রমণি আইস্যে না?' প্রথমদিকে দু'একবার জবাব দিলেও পরে জবাব দেয়া বন্ধ করেছে ভুবনেশ্বরী।

আমারবই.কম

চেরাগের তেল ফুরিয়ে এসেছে। বাতি প্রায় নিবু নিবু। ভুবনেশ্বরী চেরাগে বোতল থেকে তেল ঢেলে দিল।

আমারবই.কম

সে-রাতে মধুরামদের বাড়িতে মনসাপুঁথি পাঠ হচ্ছে। আওয়াজ ভেসে আসছে—রাময় রাময় রাম, রাম রাম রাম—শ্রাবণেতে। সঙ্গে ঢোল-কাঁসা, মন্দিরার আওয়াজও। ভুবনেশ্বরীর বড় আশা ছিল নিজের বাড়িতে পুঁথিপাঠের আসর বসাবে। স্বামীকে বলেওছিল। চন্দ্রমণি রাজি হয়েছিল। এই জো'র পরে, কোনো একদিন পুঁথিপাঠের আয়োজন করবে সে। কিন্তু, সে আশা বুঝি আর পূরণ হল না।

আমারবই.কম

পুঁথিপাঠের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীও এগুচ্ছে। লখিন্দরের মৃত্যু-কাহিনী, বেহুলার বিধবা হবার কাহিনী; পুঁথির কথাগুলো ভুবনেশ্বরীর মনে খুব করে বিঁধছে আজ। বুকে প্রচণ্ড একটা চাপ অনুভব করছে সে।

'চন্দ্রমণি আইজো নো আইয়ে বউ?' শ্বশুরের প্রশ্নে বাস্তবজগতে ফিরে আসে ভুবনেশ্বরী। বলে, 'নো আইয়ে।'

শ্রাবণমাস জেলেদের জীবনে বড় সুখের মাস, স্বস্তির মাস। এইমাসে মা-গঙ্গা তাদেরকে উজাড় করে মাছ দেয়। ইলিশমাছে, লইট্যামাছে তাদের জাল ভরে যায়। দুর্দিনের দারিদ্র্যের যন্ত্রণা তারা শ্রাবণমাসে ভোলে। আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন—এই চারমাসে তাদের হাঁড়িতে ভাত থাকে, পরনে নতুন কাপড় থাকে, মুখে হাসি থাকে। বাকি আটমাস খেয়ে না-খেয়ে তাদের দিন কাটে। তাদের ব্যাঙের সংসার। ঘরে অনেক মুখ। অনেক মুখের খাবার যোগাড় করতে পারে না গৃহকর্তারা। অভাব-অসুখের খরতাপে দগ্ধ হতে হতে তারা যখন শ্রাবণে এসে পৌঁছায়, তখন পরম শান্তি।

মনসা তাদের অন্যতম প্রধান দেবী। সর্পের দেবী মনসাকে তাদের বড় ভয়। তাঁর জন্যে তাদের বড় সম্ভ্রম। সর্প জলজ হিংস্র প্রাণী। জেলেরা জলচর। সর্পের দংশনে অনেক জেলের মৃত্যু ঘটে। তারা বিশ্বাস করে—মনসাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে সর্পের কোপানল থেকে তারা রেহাই পাবে। তাই, গোটা শ্রাবণমাস জেলেদের ঘরে ঘরে সর্পদেবী মনসার পূজা হয় সাড়ম্বরে। প্রতিরাতে মনসাপুঁথি পাঠ হয়—এর বাড়ি, ওর বাড়ি। হরিপদ, রবিশংকর, সুবল, মনোরঞ্জন, কেষ্ট, গৌরাঙ্গরা মনসাপুঁথি পাঠ করে। সঙ্গে বিচ্ছেদ গান। হারমোনিয়াম, জোরখাই, কাঁসার আওয়াজে গোটা জেলেপাড়া জুড়ে একধরনের মাদকতার সৃষ্টি হয়। বৈরাগী ঢুলি বড় সুন্দর জোরখাই বাজায়। দীনবন্ধু যখন হারমোনিয়ামে বিচ্ছেদ গানের সুর তোলে, শ্রোতার চোখে জল না এসে পারে না।

আজ জয়কৃষ্ণের বাড়িতে মনসাপুঁথি পাঠের আসর বসেছে। চারদিকে অনুচরণ, জগবন্ধু, জীবনকৃষ্ণ, সুখমোহন, হরিনারায়ণ, মুরালী এবং আরো অনেকে গোল হয়ে বসেছে। আজ রাতে বৃষ্টি নেই। তাই উঠানে পুঁথিপাঠের আয়োজন করা হয়েছে। মেয়েরা একটু দূরে আড়াল মত একটা জায়গায় বসেছে। এর মধ্যে ঘরের কাজকর্ম সেরে নিয়েছে তারা। কাইমপতি, ধনকুমারী, গোলকেশ্বরী, সরলা, শ্যামতারারা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে। ভুবনেশ্বরীও ছেলে গঙ্গাপদকে কোলে নিয়ে একপাশে বসেছে। গঙ্গাপদর আবদার রাখতে আজ পুঁথিপাঠের আসরে এসেছে সে।

মহিলামহলে টুকটাক কথা হচ্ছে। কাইমপতি বলছে, 'বেচারিরে দেইলে কইল্‌জা ফাডি যা-গই। কিয়ইম্যা সোনার অঙ্গ কালা অই যারগই।' 'আজিয়া ছদিন পারঅই গেল গই, গঙ্গাপদর বাপতারা ফিরি নো আইল'—দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শ্যামতারা বলল। ভুবনেশ্বরী শুনছে, কিছু বলছে না। দুফোটা অশ্রু বুঝি তার চোখের কোনে চিকচিক করছে, আলো-আঁধারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

পুঁথিপাঠ এখনো শুরু হয়নি। কারণ নাউট্যাপোয়া এখনো সাজঘর থেকে আসরে এসে পৌছেনি। শ্রোতা-দর্শকরা ঘন ঘন ঘরটির দিকে তাকাচ্ছে। সেখানে নাউট্যাপোয়া শাড়ি পরছে, মেকআপ নিচ্ছে। পুঁথিপাঠের আসরের প্রধান আকর্ষণই এই নাউট্যাপোয়া। শ্রাবণমাসের জন্যে নাউট্যাপোয়াদের ভাড়া করে আনা হয়। ভাড়া মাসে দেড়শ থেকে দুশো টাকা। শরীর খারাপ না করলে প্রতিরাতে পুঁথিপাঠের আসরে তাদের নাচতে হয়। বয়স তাদের চৌদ্দ থেকে ষোলো বছর। বন্দর, বুরুমচরা, করল, কোলা—এসব গ্রাম থেকে তাদের আনা হয়। মেয়েদের পোশাক পরে মুখে কড়া পাউডার মেখে বুকে মেকি স্তন লাগিয়ে তারা আসরে ঘুরে ঘুরে নাচে। গ্রামে কিছু ছাণ্ডাপোয়া থাকে, এরা নাউট্যাপোয়া আনা ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যাপারে তদারক করে। নাউট্যাপোয়া এই ছাণ্ডাদের দখলে থাকে সারামাস।

এই বছর উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ায় যে নাউট্যাপোয়াটি আনা হয়েছে, তার নাম প্রেমদাশ। বড় মিষ্টি চেহারা তার। এখনো মুখে দাড়ি-গোঁফ গজায়নি। রঙ ফর্সা। কাঁধ পর্যন্ত বাবরিচুল। চোখের দৃষ্টিতে একধরনের মাদকতা আছে। একহারা গড়ন, বেতের মত শরীর। উপেন্দ্র ও চন্দ্রমোহন কোলাগ্রাম থেকে প্রেমদাশকে শ্রাবণমাসের জন্যে ভাড়ায় এনেছে।

বৈরাগী কাঁধে জোরখাই নিয়ে আসরে উঠে দাঁড়িয়েছে। দুহাতে ঢোলে বোল তুলছে মৃদুভাবে। মুখে তাক-ধিনা-তাক-ধিনা ধিন আওয়াজ। ধীরে ধীরে ঢোলের আওয়াজ বড় হচ্ছে। সাথে হারমোনিয়ামের মৃদু লয়, কাঁসা বাজাচ্ছে কৃষ্টপদ। বৈরাগীর সঙ্গে যেন কৃষ্টপদরই প্রতিযোগিতা। কাঁসা বাজাতে কৃষ্টপদর মত ওস্তাদলোক আশপাশের দুচার গ্রামে নেই।

মিলিত বাদনধ্বনি ধীরে ধীরে উচ্চকিত হতে হতে ঝুপ্ করে থেমে গেল। দেখা গেল—প্রেমদাশ আসরে ঢুকছে। চারদিকে মৃদু গুঞ্জন উঠল। প্রেমদাশ ছেলে না মেয়ে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। পায়ে ঝুনঝুনি, মুখে কড়া রঙ, উঁচু স্তন; শাড়ির পাড়ের বাধাকে অমান্য করে ডানপাশের স্তনটা বেরিয়ে আছে। আসরে ঢুকে ঝুম্‌ঝুম্ করে এক পাক চক্কর মেরে হাত জোড় করে পূর্বমুখী হয়ে সে বন্দনাগীতি শুরু করলো—

শত নমস্কার আমার শত নমস্কার,
অধীনে গান করি সভার মাঝার,
আমার শত নমস্কার।
অধীন এই বাঙ্গাল ছেলে গান করিব আজ্ঞা পেলে
গান করিব আজ্ঞা পেলে
সরস্বতীর গানতলে শত নমস্কার,
আমার শত নমস্কার।
অধীনেরি এই প্রার্থনা,
সভা ছেড়ে কেউ যাইওনা
সভা ছাড়ি কেউ যাইও না।
গান শুনিবে বসে বসে
সভার মাঝার।
শত নমস্কার।

বন্দনাগীতি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগীর জোরখাই ঝড়ের গতিতে বেজে উঠল। সাথে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র। প্রেমদাশ ঝুমাঝুম্ করে আসরের বৃত্তের ভেতর একবার নেচে এল। আনন্দমোহন গান ধরল—

এ সংসারে থাকা যাবে না।
আজ নহে কাল যেতে হবে চিন্তা করে দেখ না।
সংসারে করিলে গমন অবশ্য হইবে মরণ,
চিরজীবী নয়রে কখন কর না ভুল ধারণা।

অনিত্য সংসার মাঝে নিশার স্বপন,
পথিকে পথিকে যেমন পথের আলাপন;
যখন মুদিবে নয়ন তোমার তো কেউ রবে না।

গানের সাথে সাথে প্রেমদাশের নাচ চলছে। চোখে তার ভুবনমোহন কটাক্ষ, তার নাচের ভঙ্গিতে তরুণদের মধ্যে আহা উহু শুরু হয়ে গেছে। বয়স্করা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

অন্নচরণ বললো, 'গত পাঁচ বছরত প্রেমদাইশ্যার মত নাউট্যাপোয়া এই গেরামত্ নো আইয়্যে।'

আশপাশের কেউ তার এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করল না। তাদেরও একই অভিমত।

মহিলামহলে গা টেপাটেপি শুরু হয়ে গেছে। পাতনিবুড়ি বলে উঠল,'কী সোন্দর নাচ্‌রে বাপ পোয়া ইবার। নাচ্ দেই এই বয়সতও বুকগান্ খালি খালি লাআর।'

বিজনবিহারী এই জেলেপল্লীর সর্দার। আসরের সামনের দিকে সে বসেছে। প্রেমদাশ নাচতে নাচতে কখনো এর কোলে বসছে, আবার কখনো ওর গায়ে উদ্ধত স্তনের ধাক্কা দিচ্ছে। সাথে সাথে হাসির দমকও উঠছে আসরে। একসময় সে নাচতে নাচতে বিজন সর্দারের কোলে বসে পড়ল। তার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করতেই আসরে হাসির ধুম পড়ে গেল। সর্দার কোনোরকমে প্রেমদাশকে ঠেলে দিলো তার কোল থেকে। নিজের ইজ্জত বাঁচাতে বাঁচাতে প্রেমদাশের দিকে দশ টাকার একটি নোট ছুঁড়ে দিল। সর্দারের দেখাদেখি তারিণীচরণ, জগবন্ধু, তরণী উপেন্দ্র, কালীমোহনরাও দু'পাঁচ টাকা আসরের বৃত্তের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। প্রেমদাশ সে টাকাগুলো হাতে তুলে না নিয়ে নাচের তালে তালে কোমর বেঁকিয়ে চিৎ হয়ে মাটি থেকে মুখ দিয়ে তুলে নিতে লাগল। দর্শকের মধ্যে তারিফের ধ্বনি উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুবল সেই টাকাগুলো দিয়ে মালা তৈরি করে প্রেমদাশের গলায় পরিয়ে দিল।

বৈরাগী আজ প্রাণখুলে বাজাচ্ছে। জোরখাইয়ের তালে তালে প্রেমদাশ কখনো কোমর দুলিয়ে, কখনো চোখ টিপে, কখনো হাঁটুর ওপর শাড়ি তুলে নাচছে। দর্শকরা বেশি আনন্দ পাচ্ছে—যখন প্রেমদাশ কারো মুখের কাছে গিয়ে হাঁটুর ওপর শাড়ি তুলে সামনে পিছনে দোলা দিতে দিতে নাচছে। এরকম নাচ দেখে মেয়েদের মধ্যে গা টেপাটেপি বেড়ে যায়।

এসময় ভুবনেশ্বরী ছেলেকে জাগানোর চেষ্টা করে। ছেলেটা তার কোলে নেতিয়ে আছে।

'অপুত, উঠ, নাচ শেষ অই যারগই। তুই নো কঅলি নাচ চাবি?' ভুবনেশ্বরী গঙ্গাপদর কানের কাছে ফিসফিস করে বলে। গঙ্গাপদ চোখ কচলাতে কচলাতে

উঠে বসে। তখন প্রেমদাশের নাচ প্রায় তুঙ্গে পৌঁছে গেছে। আসরের চারদিক থেকে নানারকম শব্দ উঠছে। সে শব্দ আনন্দের, সে শব্দ কামুকতার।

নাচের শেষে পুঁথিপাঠ শুরু হয়। আনন্দের গানের শেষ লাইনটি পুঁথিপাঠে ধুয়া হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আজ পাঠ হচ্ছে সে অংশ, যেখানে সর্প লখিন্দরকে কেটেছে। নিঃস্ব, সর্বহারা বেহুলা হাহাকার করছে তার স্বামীর জন্যে। বড় দরদ দিয়ে পুঁথির এ অংশটি সুর করে পড়ছে জগবন্ধু।

মধ্যরাত পেরিয়ে গেলে পুঁথিপাঠের আসর শেষ হয়। কেউ আনন্দ, কেউ হা-হুতাশ নিয়ে বাড়ি ফিরে। কম বয়সের ছোকড়া-ছুকড়িরা প্রেমদাশের নাচে ও ভঙ্গিতে বিভোর হয়ে আছে। আর বয়স্করা বেহুলা-লখিন্দরের বেদনাময় ঘটনায় আপ্লুত। বুকভরা কষ্ট নিয়ে ভুবনেশ্বরী বাড়ি ফিরে। পাশে ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে সেও শুয়ে পড়ে বিছানায়। চোখে তার ঘুম নেই।

পুঁথিপাঠের আসর ভাঙার পর যে যার বাড়িতে চলে গেলেও প্রেমদাশকে ঘিরে সুবল, চন্দ্রমোহন, উপেন্দ্র, কালীমোহনদের হুল্লোড় চলছে। প্রতিরাতে নাচ শেষে প্রেমদাশকে ঘিরে এদের মধ্যে এরকম হুল্লোড় হয়ে থাকে। সুবল, চন্দ্রমোহন,উপেন্দ্ররা অবিবাহিত। নাচ শেষে প্রেমদাশ এইসব ছাভাপোয়াদের কামনা-বাসনা মেটায়। গতরাত প্রেমদাশ উপেন্দ্রের সঙ্গে কাটিয়েছে। আজ সুবল দাবি করছে প্রেমদাশকে। তার চোখে-মুখে প্রবল রিরংসার ছাপ। কিন্তু চন্দ্রমোহনও ছাড়ার পাত্র নয়। সে বলছে,'প্রেমদাইশ্যা আজিয়া আঁর।'

সুবল বলছে,'আজিয়া আঁর লগে নাউট্যাপোয়া রাইত কাডাইব।'

ব্যাপারটা মনকষাকষির রূপ নেয়ার আগেই উপেন্দ্র মধ্যস্থতা করে। চন্দ্রমোহনের উদ্দেশে বলে, 'প্রেমদাইশ্যা আজিয়া সুবইল্যার লগে ফুতক। কালিয়া পুঁথিপাঠ অইতো নো। গোডা রাইত প্রেমদাইশ্যারে তুই খাইত পারিবি।' বলে সে চন্দ্রমোহনকে লক্ষ করে বিশ্রীভাবে চোখ টিপে।

উপেন্দ্রের কথা শেষ হতে না হতেই সুবল প্রেমদাশকে জড়িয়ে ধরে রওনা দেয়।

দুই

পাঁচ বছর কেটে গেছে। গঙ্গাপদ এখন আট বছরের বালক। স্কুলে যায় সে। দুই মাইল পথ ঠেঙিয়ে খালের পাড় ধরে সে কাটগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে যায়। পড়তে যায় মা ভুবনেশ্বরীর প্রবল উদ্যোগে।

ভুবনেশ্বরী চায় না—চন্দ্রমণির মতো গঙ্গাপদও মা-গঙ্গার ভোগে যাক। তাই সে স্থির করে—গঙ্গাপদ পড়বে, সমুদ্রে মাছ মারতে যাবে না কখনো। ভুবনেশ্বরী কিছুতেই তাকে সমুদ্রে যেতে দেবে না।

উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়াটি ভদ্র লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। ভদ্রপল্লী থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে বঙ্গোপসাগরের কোলে পাড়াটি নীরক্ত হয়ে শুয়ে আছে। হিন্দু ও মুসলিম পাড়াগুলো এই জেলেপাড়াটি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করছে। সেখানে তাদের জীবন চলছে সংস্কৃত পরিমণ্ডলে। কিন্তু জেলেপাড়ার জীবন গাবের রসে চুবানো। এখানে প্রাণ আছে, প্রাণবান পরিবেশ নেই। জীবন আছে, জীবনায়নের সুস্থির বাতাবরণ নেই। এদের জীবনরস ফুরিয়ে যায় পারস্পরিক গুঁতোগুতিতে। হিংসা, কুৎসা, গালিগালাজ, ছোটোখাটো মারামারি এই পাড়াটিকে জাগিয়ে রাখে সারাক্ষণ। আর আছে জেলেপাড়ার সারা গায়ে শত শতাব্দীর দারিদ্র্যের গভীর চিহ্ন। মানুষগুলোর চোখে অসহায় চাহনি, মুখে বঞ্চনার দগদগে ঘা। পড়াশোনা জেলেদের কাছে বিলাসিতা, মেয়েরা জন্মেছে ভাত রাঁধার জন্যে আর বছর বছর সন্তান বিয়োবার জন্যে। দশ-বারো বছর পেরোলেই ছেলেকে যেতে হয় সমুদ্রে বা খালে-বিলে মাছ ধরতে। কোনো জেলে বা জেলেনি চিন্তাই করে না, তার সন্তানটি লেখাপড়া শিখুক। প্রায় প্রত্যেক পরিবারে আট-দশ জন করে সন্তান। অকালবার্ধক্যে ঝুঁকে-পড়া জেলেটির পক্ষে দশ-বারো জনের সংসারের ঘানি টানা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই, ছেলেরা একটু মাথা-উঁচু হলেই বাপের সঙ্গে মাছ ধরতে যায়। যদি সংসারে দুটো টাকা বেশি আসে!

এরই মাঝে ভুবনেশ্বরী প্রতিজ্ঞা করে—তার ছেলে গঙ্গাপদ পড়াশোনা করবে। হিন্দু-মুসলমানের সন্তানদের মতো সেও শিক্ষিত হয়ে বাপের অপমৃত্যুর দাগ ভুবনেশ্বরীর হৃদয় থেকে মুছে দেবে।

ভুবনেশ্বরীর জীবন থেকে পাঁচটি বছর খসে গেছে। অবসন্নতা ও বিষণ্ণতাময় পাঁচটি বছর। অথচ কী উজ্জ্বল দিন ছিল তার, মোহনীয় রাত্তির। নয় বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। স্বামী চন্দ্রমণি তখন উনিশ বছরের তরুণ। দীর্ঘদেহী, সুঠাম দেহ তার। অন্যান্য জেলেদের মতো কালো নয় সে। উজ্জ্বল শ্যামলা। সোজা সোজা চুল, ঘাড় পর্যন্ত নামানো। কটা চোখ, সে চোখ মায়াময়। সে মায়াময় চোখের চাহনি ভুবনেশ্বরীকে ভয় পাইয়ে দিত। বিবাহ ও বৈবাহিক জীবন সম্বন্ধে কিছু বুঝতো না সে। মাঝেমধ্যে বিবাহোত্তর জীবনযাপন ভুবনেশ্বরীর মনে-দেহে ভয় ও শিহরণ জাগাতো। তারপর নানা সাংসারিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে, ধীরে ধীরে যোগ্য হয়ে উঠার অবসরে সে চন্দ্রমণিকে ভালবাসলো। প্রতিদানে পেল আরও নিবিড় ভালবাসা, আরও প্রবল নৈকট্য। জেলে-দম্পতির মধ্যে এরকম ভালবাসাবাসি হাস্যকর।

জেলেকন্যার যখন বিয়ে হয়, তখন সে একেবারেই অপরিপক্ব। ছেলেরাও কৈশোরের গণ্ডি পেরোয় মাত্র। কিন্তু দুটো শরীর কাছাকাছি আসে, শরীর নিয়ে তারা নাড়াচাড়া করে। অসফল চেষ্টায় রত হয় সদ্য তরুণরা; বালিকারা পালিয়ে বেড়ায়। পালিয়ে আশ্রয় নেয় শাশুড়ির কাছে। শাশুড়ি বুঝতে পারে। কারণ, তার

জীবনেও এরকম একটা সময় গেছে। ফলে শরীরী-ভয়ে ভীত বউ শাশুড়ির কাছে প্রশ্রয় ও আশ্রয় পায়। তবে তা বেশিদিনের জন্যে নয়। মহাবুভুক্ষা নিয়ে পুরুষ একদিন ঝাঁপিয়ে পড়ে বালিকাবধূর ওপর। শরীরের আড় ভাঙে। এই আড় ভাঙাভাঙিতেই সন্তান আসে পেটে। তাই জেলেপল্লীতে দাম্পত্য-ভালবাসা দানা বাঁধে না। শুধু প্রয়োজনের খেলায় মগ্ন হয় তারা। প্রয়োজন ফুরোলেই জেলেপুরুষ বাইরের এবং জেলেনারী সংসারের ডামাডোলে ক্লিষ্ট হতে থাকে।

কিন্তু ভুবনেশ্বরী-চন্দ্রমণির মধ্যে ভালবাসা দানা বেঁধেছিল। ভুবনেশ্বরীর বাপের বাড়ি চট্টগ্রাম শহরে। কর্ণফুলী নদীঘেঁষা মাঝিরঘাট এলাকার মাইজপাড়া নামের জেলেপাড়ায় ভুবনেশ্বরী জন্মেছিল। বাপ-দাদা নদীতে-সাগরে নৌকায় করে বড়শি বাইতো। বংশানুক্রমে তাদের গায়ের রঙ ছিল ঈর্ষণীয় ফর্সা। ভুবনেশ্বরীও সুন্দরী। টুকটুকে ছোট্ট একটি মুখ, আজানুলম্বা চুল। একহারা মাঝারি আকারের ভুবনেশ্বরী কনে হিসেবে খুবই আকর্ষণীয় ছিল সে সময়ের বিয়ের বাজারে। নানা জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতো। কিন্তু বাপ নৈদরবাঁশির কোনো বরপক্ষকেই পছন্দ হচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত চন্দ্রমণিকে দেখে সে মুগ্ধ হল। ছয়কুড়ি টাকা কন্যাপণের বিনিময়ে মেয়ে বিয়ে দিতে রাজি হল নৈদরবাঁশি। গামছাপরা নয় বছরের ভুবনেশ্বরীকে এনে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হল। বিয়ে কি, কেন বিয়ে—এসব কিছুর মাহাত্ম্য সে বুঝলো না, শুধু বুঝলো তার মা-বাপ, বোন এবং ভাই জগৎহরিকে রেখে দূরগাঁয়ের কোনো এক ঘরে তাকে চলে যেতে হবে। আকুল হয়ে কাঁদলো সে, মা-বাপ মারা গেলে ছোট বাচ্চারা যেভাবে কাঁদে।

শ্বশুরবাড়িতে এসে সে শাশুড়ি সত্যবতীকে পেল। বাপের স্নেহ নিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো শ্বশুর হরিবন্ধু। দু'জনেই ভুলিয়ে দিল বাপের বাড়ির শোক। শ্বশুর-শাশুড়ির বাৎসল্য এবং চন্দ্রমণির সোহাগে সিক্ত হতে হতে ভুবনেশ্বরী বউ থেকে মায়ে রূপান্তরিত হল।

তিন

উত্তর পতেঙ্গা হতে মিরসরাই পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে অনেক জেলেপল্লী। উত্তর পতেঙ্গা, হালিশহর, কাট্টলি, খেজুরতলি, ভাটিয়ারি, কুমিরা, সীতাকুণ্ড, মিরসরাই ইত্যাদি গ্রামের জেলেপাড়াগুলো সমুদ্রের কোল ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত জেলেপল্লীর জেলেদের জীবন ও জীবিকা সাগরের কাছে বাঁধা। সাগরের শস্যে এই জলপুত্রদের জীবন চলে। তাদের বাঁচা-মরা সাগরের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। বেশি মাছ পেলে উল্লাস, কম মাছে জীবন বিপর্যস্ত। জীবিকার প্রয়োজনে জেলেরা জোয়ার ভাটার হিসেবে দুবার করে সমুদ্রে যায় মাছ ধরতে। মাছ ধরার নানা জাল, নানা কায়দা। বিহিন্দিজাল, টংজাল দিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরে তারা, বড়শিও বায় মাঝেমধ্যে। আর হুরিজাল, টাউঙ্গাজাল কম পানির জাল।

বিহিন্দিজাল, টংজাল বসাতে অনেক টাকা, অধিক জনবলের প্রয়োজন। জেলেদের জনবলের অভাব নেই। অভাব শুধু টাকার। সব জেলে বিহিন্দিজাল, টংজাল বসাতে পারে না। অধিকাংশ জেলেই গরিব, ভীষণ গরিব। তারা জোয়ার ভাটায় বুক-পরিমাণ পানিতে হুরিজাল টাউঙ্গাজাল বায়। করকইজ্যা ইচা, সুন্দরীমাছ, পোপামাছ ধরা পড়ে এইসব জালে। তবে পরিমাণে খুবই কম। এগুলো তারা বাজারে, ভদ্রলোকের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। মাছ বিক্রির টাকায় দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটে না। চাল-ডাল কিনলে নুনের পয়সা থাকে না, নুন কিনলে তেলের পয়সায় টান পড়ে। এভাবেই জীবন চলে তাদের।

সচ্ছল জেলেদের জীবন অন্যরকম। তাদের নৌকা আছে, ছোট বড় নানা আকারের জাল আছে—পেরিনজাল, ঝাঁকিজাল, হুরিজাল, টাউঙ্গাজাল, বিহিন্দিজাল, টংজাল, কাঠিজাল। আর আছে সমুদ্রে বড়শি বাওয়ার নানারকম সরঞ্জাম। এরা বহদ্দার। নৌকায় করে গভীর সমুদ্রে গিয়ে তারা বিহিন্দিজাল বসায়। জাল বসানোর কায়দাও আছে। দুটো গাছের খুঁটি, যাকে ওরা গোঁজ বলে, গভীর পানির নিচে বিঁও দিয়ে ভাল করে পুঁতে দেয়। সে খুঁটিতে বাঁধা থাকে লোহার মোটা তার। তারের অপর মাথায় দুটো লম্বা ভাইজ্যাবাঁশ বেঁধে দেয়া হয়। দুই বাঁশের আগায় বেঁধে দেয়া হয় বিহিন্দিজালের দুই পাখা। জালের মুখে থাকে ফং—ছ-সাত হাত দীর্ঘ মোটা বাঁশের অংশ। জোয়ার বা ভাটার টানে জাল জলের তলায় নেমে যায়। জালের হা-করা মুখে মাছ ঢোকে। তিন ঘণ্টার জোয়ার বা ভাটায় চিক্কা ইচা, লইট্যা, ফাঁইস্যা, ঘোড়া, তপসে, লাক্ষা, ভোলপোপা ইত্যাদি মাছ জালে ঢোকে। পানির টান কমে এলে জাল জলের ওপরে ভেসে ওঠে। জেলেরা জালের ছঅরি থেকে মাছ নৌকায় তুলে নেয়। জাল জোরের টানে আবার চলে যায় পানির তলায়।

উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ায় বহদ্দার আছে দশজন। তাদের নৌকা-জাল আছে, জনবল আছে। মাথা-উঁচু ছেলেরা তো বাপের সঙ্গে মাছ ধরতে যায়-ই, প্রয়োজনে নানা গ্রাম থেকে মাছধরার মরসুমে গাউর আনে তারা। এই গাউররা চার-পাঁচ মাসের জন্যে থোক-টাকার বিনিময়ে বহদ্দারদের বাড়িতে আসে। থাকা-খাওয়া মুফত। সকাল-সন্ধ্যায় মাছ ধরতে সমুদ্রে যায় তারা, মাছ ধরার কাজে কঠোর কায়িক-শ্রম দেয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বর্ষা-বাদলে-বজ্রপাতে উত্তাল সমুদ্রে পাড়ি দেয় তারা। লাভের মালিক বহদ্দাররা।

বিজনবিহারী, কামিনীমোহন, মণীন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, রামনারায়ণ এ পাড়ার নামকরা বহদ্দার। চুপড়ি ভর্তি মাছ তাদের উঠানের এধার ওধার পড়ে থাকে। বিয়ারি বা ক্রেতাদের ভিড়ে তাদের উঠান গম গম করে। গোপাল, গুড়াইয়া, মোহনবাঁশি, রাইমোহন, লালরামরা বহদ্দারদের কাছ থেকে মাছ কিনে ভারে করে পাড়ায় হাটে বেচে। বিক্রি শেষে লভ্যাংশ দিয়ে চাল-ডাল-লাকড়ি-তরকারি কিনে বাড়ি ফিরলেই তাদের চুলায় আগুন জ্বলে। লোকসান হলে সে-বেলা নির্জলা উপোস।

এই জেলেপল্লীর অনেক নারী বিধবা। তাদের স্বামীরা সমুদ্রে মরেছে। কেউ ঝড়ের কবলে পড়ে, কেউ জালের সঙ্গে আটকে অতল পানির নিচে গিয়ে। সাপের কামড়ে কারো কারো জীবনলীলা সাঙ্গ হয়েছে। দু'চারটে সন্তান নিয়ে এইসব বিধবাদের জীবন কাটে। সাঙ্গা করার নিয়ম আছে এ সমাজে। কেউ কেউ সন্তান ফেলে আবার কেউ সন্তান নিয়ে দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে যায়। বেশির ভাগ বিধবা পিতৃহারা সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে সাঙ্গা করে না। সন্তানরা নাবালক, আয়-সক্ষম নয়। ফলে এই স্বামীহারা জেলেনিরা মাছ বিক্রি করে। গুড়াইয়া, মোহনবাঁশিদের মতো তারাও বহদ্দারদের কাছ থেকে মাছ কিনে মাথায় করে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। হাঁক দেয়, 'মাছ লইবা না মাছ, লইট্যা মাছ, চিক্কা ইচা, ভালা মাছ, তাজা মাছ।' হিন্দু ও মুসলিম পাড়ার নারীরাই তাদের প্রধান ক্রেতা। তারা এইসব জেলেনির কাছ থেকে নিজেদের হাতে বেছে বেছে মাছ কেনে। নিজেদের হাত দিয়ে দু'চারটে বেশি তুলে নেয়। বাধা দিলে বলে, 'মক্ত মাআনা দইজ্যাত্তুন মাছ ধরি আনচ। দুউআ চাউরগা বেশি লইলে কোঁ কাঁ কা গরচ্?'

এরা জানে না এই বিধবা নারীরা কী ভাবে মাছ আনে। মাছ বিক্রি শেষে তাদের হাতে লভ্যাংশ পৌছে অতি সামান্য। সেই টাকায় সন্তানের মুখে সামান্যই খাবার তুলে দিতে পারে তারা।

আমারবই.কম

জোআ ছিল রাতের বেলা। রাত শেষ হওয়ার আগে আগে মাছভর্তি নৌকাগুলো কূলে ভিড়েছে। গাউররা ভারে ভারে মাছ এনে বহদ্দারদের উঠানে জড়ো করেছে। মাছ কেনাবেচা সাধারণত সমুদ্রকূলেই হয়। কিন্তু রাত গভীর বলে ক্রেতারা আজ সমুদ্রপাড়ে যায়নি। অন্যান্য বহদ্দারদের মতো বিজন বহদ্দারের মাছও ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে। আজ বিজন বহদ্দারের উঠানে অনেক মাছ। ইচা, ফাঁইস্যা, লইট্যা, অলুয়া মাছ তো আছেই, আরও আছে পাঙ্গাসমাছ। পাঙ্গাসমাছ অন্য কারো জালে পড়েনি। শুধু বিজন বহদ্দারের জালেই পাঙ্গাসের ঝাঁক পড়েছে। কথাটা ভোর হওয়ার আগেই প্রচার হয়ে গেছে জেলেপাড়ায়। জেলেরা বলাবলি করছে, 'বিজন বহদ্দার আজিয়া লাল অই গেইয়ে গই।'

সকাল হতে না হতেই ক্রেতারা বহদ্দারের উঠানে ভিড় করেছে। এসেছে গুড়াইয়া, গোপাল, রাইমোহন, সতীশ, শম্ভু, কালামোহন আর এসেছে হরবাইশ্যার মা, মালতির মা, বংশীর মা। পুরুষ-ক্রেতারা কেনার পর যা পড়ে থাকবে, তা-ই মেয়ে-ক্রেতারা কিনবে। কারণ, পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার মতো টাকা তাদের গাঁটে নেই।

শেষরাতে সমুদ্র থেকে এসে বিজন একটু ঘুমিয়েছিল। তার বউটি পোয়াতি। ষষ্ঠ সন্তান জন্ম দেয়ার জন্যে সে প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিজন তাই বউয়ের সঙ্গে

শোয়নি। মেজছেলের পাশে নাকে-মুখে কাঁথা দিয়ে শুয়ে আছে। কিনিয়েদের হৈ-হল্লা শুনে তার ঘুম ভেঙে যায়। চোখে মুখে পানি দিয়ে সে উঠানে এসে দাঁড়ায়।

এবার মাছ বিক্রি হবে। নানা মাছের নানা দাম। নানারকম দরাদরির পর এক একজন মাছ কিনে বাড়িতে নিয়ে যাবে। মাছগুলোকে বেছে ধুয়ে চুপড়িতে করে বাজার বা পাড়ার উদ্দেশে রওয়ানা দেবে।

উঠানে বহদ্দারকে দেখে হৈচৈ একটু কমে এল। ক্রেতারা যে যেই মাছ কিনবে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। রাইমোহন লইট্যামাছের একটা ঝাঁকা দেখিয়ে বহদ্দারকে জিজ্ঞেস করল, 'এই মাছ উনর দাম কত দওন পড়িবো বহদ্দার?'

বিজন বলল, 'ষাইট টিয়া।'

রাইমোহন ত্রিশ টাকা দিতে চাইল। বহদ্দার রাজি হল না, শেষপর্যন্ত চল্লিশ টাকায় রফা হল। মাছ কিনে ধীরে ধীরে সবাই চলে যাচ্ছে। এমনকি মালতির মা ও হরবাইশ্যার মায়ের কেনাও শেষ। কিন্তু গোপাল পাঙ্গাসমাছের দুটো বড় চুপড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে কিছু বলছে না। হঠাৎ করে বিজন বহদ্দারের চোখ পড়ল তার ওপর। বহদ্দার বলল, 'কিরে গোয়াইল্যা, মাছ কিন্‌তি নো?'

আসলে সবাই চলে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল গোপাল। সবাই চলে গেলে কমদামে বিজন বহদ্দারের কাছ থেকে মাছ কেনা যাবে। বহদ্দারের কাছে গোপাল শুধু ক্রেতা নয়, অন্য কিছু।

গোপালের ছোটোখাটো গড়ন। পিঠটা একটু বেঁকে গেছে। মাথার সামনের দিকে চুল নেই। দুই কানের পাশে এবং মাথার পেছন দিকে কিছু চুল বাতাসে এলোমেলো ওড়ে। সামনের ওপরপাটির দুটো দাঁত উঁচু। কথা বলার সময় থুতু এসে শ্রোতার গায়ে পড়ে। সস্তাদামের বিড়ি খায়, একটার পর একটা। বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। পরনে সবসময় হাঁটু-উঁচু ধুতি। হরদম খুক খুক করে কাশে। নিজের জাল নেই। শরীরে বেশি জোর নেই বলে অন্যের নৌকায় গাউরের কাজও করতে পারে না। এই-ওই বহদ্দারের কাছ থেকে মাছ কিনে বাজারে বেচে কোনোরকমে সংসার চালায়। ঘরে দুটো সন্তান। বউটি তার বড়ই সুন্দর। ছেঁড়া শাড়ি, অতি পুরাতন চুলিও তার সৌন্দর্যকে মিইয়ে দিতে পারেনি। উজ্জ্বল ফর্সা রঙ তার। নাকটা ধারালো। চোখ দুটোতে কামাগ্নি খেলা করে। ঈষৎ আনত স্তন দুটো তার শরীরকে আরো লোভনীয় করে তুলেছে। দরিদ্রঘরের মেয়ে বলে গোপালের মতো বরকে মেয়ে বিয়ে দিয়েছে বকুলির মা-বাবা। গোপালের বউয়ের নাম বকুলবালা, মানুষে বকুলি বলে ডাকে।

এই বকুলির ওপর নজর পড়েছে বিজনবিহারী বহদ্দারের। বিজন বহদ্দার এবং পাড়ার সর্দার। তার অর্থ আছে, আর আছে সামাজিক ক্ষমতা। তার কালো কুচকুচে দশাসই চেহারাটার মধ্যে আসুরিক বল লুকিয়ে আছে। বলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রমণেচ্ছা তার শরীরে কিলবিল করে। বকুলিকে দেখলেই তার মুখটা

তেলতেলে হয়ে ওঠে। চোখে ভেসে ওঠে গিলে খাওয়ার লুব্ধতা। তার বউ শান্তিবালা। নামের মতোই শান্ত সে। শরীরে কোনো উত্তাপ নেই। বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থেকে বহদ্দারের প্রয়োজন মেটায়। বছর বছর বাচ্চা বিয়োয়। চোখ কোটরে বসা। স্তন চুপ্‌সে গেছে। শান্তিবালাকে দেখলে মনে হয় না, একসময় তার শরীরে যৌবন ছিল। বিজন বহদ্দারের শরীরে বড়ই অতৃপ্তি। গোপালের বউ বকুলি তার শরীরে রিরংসার ঝড় তোলে। তাকে দেখলে বহদ্দারের শরীরটা বড় আঁকুপাকু করে।

বিয়ারিরা বহদ্দারদের কাছ থেকে মাছ কিনে বাকিতে। পাড়ায়-বাজারে মাছ বিক্রি করে বেলাশেষে বহদ্দারের বাড়িতে গিয়ে মাছের দাম দিয়ে আসে তারা। গোপাল যে দামে মাছ কিনে, সেই দাম পরিশোধ করে না। কম দেয়া তার অভ্যাস। লাভ হলেও কম দেয়, লোকসান হলেতো দেয়ই। বউকে দিয়ে বহদ্দারের কাছে মাছের টাকা পাঠায় সে। বউকে দিয়ে বহদ্দারের বাড়িতে টাকা পাঠানোর রেওয়াজ জলদাসদের মধ্যে আছে। বউরা কাকুতিমিনতি করে বহদ্দারকে কম টাকা গছাতে পারে। বকুলির ক্ষেত্রে কাকুতিমিনতির প্রয়োজন হয় না। বকুলি যা দেয় বিজন বহদ্দার তা-ই হাত পেতে নেয়। গুনে দেখে না। কখনো কখনো দু'চারদশ টাকা বকুলিকে ফেরত দেয় বিজনবিহারী। দিয়ে বলে, 'ইউন রাখ। তোঁয়ার কামত লাগিবো।'

বকুলি বলে, 'তুঁই এরইম্যা গরি টিয়া দি দি আঁরে ত ঋণী গরি ফেলিলা বহদ্দার। আঁই এট্টা টিয়া হুইয্যম কেএন গরি?'

'তোঁয়াত্তোন এই টিয়া ফেরত দওন পইত্তো নো। শুধু আঁর মিক্কে ইক্কিনি চাইবা।' লোভী চোখে কথাগুলো বলে বিজন।

এ কথার অর্থ বকুলি বোঝে। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। টাকাগুলো আঁচলের কোনায় বেঁধে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। আসার সময় অর্থপূর্ণ একটি বাঁকা চাহনিতে বহদ্দারকে ছেঁড়াবেড়া করে দেয়। বহদ্দারের বুকের ধুকধুকানি বাড়ে। চোখের কোনা লাল হয়। লালায় ঠোঁট ভিজতে থাকে।

চার

সমুদ্রের পাড়ে বিয়ারিদের ভিড়। নৌকা কূলে ভিড়তে এখনো বেশ কিছুটা দেরি আছে। বহদ্দাররা বিয়ারিদের কাছ থেকে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে গল্পগুজব করছে। তাদের আলোচ্যবিষয়ের সিংহভাগ জুড়ে আছে মাছ-জাল-নৌকা। গত ডালায় তার জালে প্রচুর মাছ ধরা পড়েছে বলে বিজন বহদ্দারের মুখে তৃপ্তির হাসি। পূর্ণ বহদ্দারের মনে সুখ নেই। তার দুটো বিহিন্দিজাল স্রোতের টানে ফেঁসে গেছে। কামিনীমোহন ও মণীন্দ্র বহদ্দারকেও অখুশি মনে হচ্ছে না। গত জো'তে মাছ বেশি না পেলেও এই ডালাতে প্রচুর লইট্যা ধরা পড়ছে তাদের জালে। আরও দু'চারজন কমজোরি বহদ্দার একটু দূরে বসে তাদের কথাবার্তা শুনছে।

দূরে বসেছে পুরুষবিয়ারিরা। তারা গোল হয়ে বসে বিড়ি ফুঁকছে। কেউ কেউ গাঁট থেকে বউয়ের বানিয়ে-দেয়া পান বের করে মুখে পুরে দিচ্ছে। আর মাঝেমাঝে দূর-সমুদ্রে তাকিয়ে দেখছে নৌকার পাল দেখা যাচ্ছে কিনা। তাদের পাশে পাশে খাড়াং অর্থাৎ চুপড়ি, মাছের ভার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

পুরুষবিয়ারিদেরকে ছাড়িয়ে বেশ দূরে চার-পাঁচজন নারীবিয়ারি বসে আছে। ফুলমালার মা, মালতির মা, গুড়াবি, বংশীর মা এবং ভুবনেশ্বরী।

ফুলমালার মা ও মালতির মা বিধবা। তাদের পরনে সাদা ধুতি। ময়লা লেগে লেগে সে সাদা কাপড় একটা বিদ্‌ঘুটে রঙ ধারণ করেছে। তাদের অধিকাংশের গায়ে কোনো চুলি নেই। বয়স্ক জেলেনিরা সাধারণত কোনো চুলি পরে না। শীতের সময় পরিধেয় কাপড়কে দু'ভাঁজ করে গায়ে জড়ায়। এখন শীত নেই। ভুবনেশ্বরী ছাড়া আর কারো গায়ে চুলি নেই। ফুলমালার মা পান চিবোচ্ছে আর মালতির মা বিড়ি টানছে। গুড়াবি বংশীর মায়ের মাথার উকুন বাছছে। একটা একটা উকুন চুলের গোড়া থেকে বের করে বুড়ো আঙুলের নখে চেপে চেপে মারছে। আর সুখ-দুঃখের কথা বলছে। এদের দুজনেরই স্বামী আছে। গুড়াবির স্বামী তেমন চলাফেরা করতে পারে না। তার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। এই বয়সের জেলেরা স্বচ্ছন্দে মাছ ধরতে যায়। কিন্তু হরিনারায়ণ সবসময় মাছ ধরতে যেতে পারে না। লম্বা চওড়া মানুষ সে। সোজা হয়ে সে হাঁটতে পারে না। তার অণ্ডকোষটা বিরাট। বিজলা জমে জমে এটার আকার ছোটোখাটো একটা কুমড়ার মতো হয়ে গেছে। হাঁটতে গেলেই দুই উরুর মাঝখানে অবস্থান নেয় সেটা। ফলে হরিনারায়ণের হাঁটায় বিঘ্ন ঘটে। এক কদম দিতে দশ কদমের সময় নেয়। সকল কষ্টকে হজম করে মাঝেমাঝে টাউস্যাজাল নিয়ে বের হয় সে। খালে-বিলে জাল ঠেলে দু'চারদশ টাকার মাছ ধরে আনে। কিন্তু তা দিয়ে পাঁচজনের সংসার চলে না। তার দুই ছেলে এক মেয়ে। মেয়েটা বড়, ছেলে রাধামোহন ও হরিমোহন এখনো নাবালক।

মাঝারি আকার গুড়াবির। শ্যামলা রঙ। চুলগুলো রুক্ষ। অনেকদিন চুলে তেল দেয়া হয়নি তার। চোখ দুটোর নিচে কালি জমেছে। শরীরে যৌবনের শেষবিকেলের আলো ঝিলিক দিচ্ছে। স্বামী-সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অনেক আগে থেকে বিয়ারিগিরি শুরু করেছে সে। হরিনারায়ণের শারীরিক অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে গুড়াবির দিকে আঙুল তোলে সমাজের কেউ কেউ। মুসলিমপাড়ার আবদুল মজিদ কারণে-অকারণে সকালে-রাতে যাতায়াত করে গুড়াবির বাড়িতে। গভীর রাতের দিকেই তাকে দেখা যায় বেশি। মজিদের সঙ্গে গুড়াবির সম্পর্কের ব্যাপারটি দু'মুঠো অন্নের জন্যে।

অণ্ডকোষটা বিশাল বলে গাঁয়ের দুষ্টু ছেলেমেয়েরা হরিনারায়ণকে আইল্যা বলে ডাকে। হরিণারায়ণ না শোনার ভান করে। ছেলেমেয়েরা পিছু নেয়। বার বার

ব্যঙ্গের স্বরে চিৎকার করে, 'আইল্যা—আইল্যা।' সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেলে হরিনারায়ণ অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেয়া শুরু করে। পিছু-নেয়া ছেলেমেয়েগুলো রাগের পরিবর্তে উল্লসিত হয়। আরও জোরে চিৎকার করে ওঠে, 'আ-ই-ল্যা।'

বংশীর মায়ের নাম যে কী তা আজ মানুষরা ভুলে গেছে। লম্বা, কুচকুচে কালো সে। শরীরে পুরুষালি ভাব। কাউকে তোয়াক্কা করে কথা বলে না। পানের কষ লেগে লেগে দাঁতগুলো তরমুজের বিচির মতো হয়ে গেছে। চোখ দুটো খুবই তীক্ষ্ণ। এই কালো চেহারার ভেতরে একটি দরদি মন আছে। স্বামীটিও তার মতো দীর্ঘদেহী। চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। মাথার পেছনে একগোছা চুলের বিষত খানেক লম্বা টিকি। বিশাল গড়ন। শারীরিক বিশালত্ব ভোলানাথের বুদ্ধিকে খাটো করে এনেছে। বুদ্ধিহীন হাঁদারাম বলেই তাকে জলদাসপাড়ার সবাই জানে। ঘরে তার তিনটা ছেলেমেয়ে। বুড়ি মাও আছে। বারান্দার এককোনে মাদুর পেতে তাকে থাকতে দিয়েছে ভোলানাথ। বুড়ি কুক্‌কুক্ করে কাশে আর থুতু ফেলে। মাঝেমাঝে ক্ষুধার যন্ত্রণায় চেঁচায়। ভোলানাথ ঝড়-বৃষ্টি-শীত ঠেলে প্রায় প্রতিরাতে টাউঙ্গাজাল বাইতে যায়। বেশিরভাগ সময় অল্প মাছ নিয়ে ফিরে। কিন্তু যেদিন কপাল ভাল হয়, সেদিন লইল্যা ইচা, চিড়িং মাছ, কাঁকড়া ভর্তি দুইজ্যা নিয়ে বাড়ি ফিরে। ভোরসকালে বাড়ি ফিরেই সে গঙ্গাপদদের পুকুরে স্নান করতে নামে। রাতে জাল বাইতে যায় সে একটা নেংটি পরে। সেটা পরেই সে মানুষের দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে পুকুরে নামে। এক কোমর পানিতে গিয়ে নেংটিটা খুলে সেটা দিয়ে গা ডলে। বাড়ি ফিরে টিকিতে তুলসীপাতা ও দূর্বা বাঁধে। কপাল থেকে নাকের মাথা পর্যন্ত গঙ্গামাটির ফোটা কাটে। তারপর হাঁটু-উঁচু ধুতি পরে খালি গায়ে পাড়া ভ্রমণে বের হয়। হাতে মন্দিরা, মুখে কৃষ্ণের নাম। মৃদুভাবে ডানে বাঁয়ে মাথা দুলিয়ে সে জেলেপাড়ার উঠানে উঠানে ঘোরে। ঘুরে ঘুরে সেই ভোরসকালে ভোলানাথ ঘুমন্ত, অর্ধজাগ্রত মানুষদেরকে কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম সুর করে শোনায়—

শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন।
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন॥
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল।
ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল॥
সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই।
শ্রীদাম রাখিল নাম রাখালরাজা ভাই॥

ফুলমালার মা আর বংশীর মায়ের কাছ থেকে একটু তফাতে বসে আছে ভুবনেশ্বরী। মাছবিয়ারি হিসেবে আজকেই প্রথম সে সমুদ্রে এসেছে। বংশীর মা-ই নিয়ে এসেছে তাকে। চন্দ্রমণি নিখোঁজ হবার পর বংশীর মা নিকট আত্মীয়ের

মতো ভুবনেশ্বরীর খোঁজখবর রেখেছে। গত পাঁচ বছর শুধু বেঁচে থাকার জন্যে ভুবনেশ্বরী কঠোর সংগ্রাম করে গেছে। চন্দ্রমণির নৌকা ছিল না। অন্যের নৌকায় পাউন্যা হিসেবে জাল বসাতো সে। তার দুটো বিহিন্দিজাল ছিল। চন্দ্রমণি সমুদ্রে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর অভাবের তাড়নায় একটি একটি করে দুটো বিহিন্দিজালই বিক্রি করে দিয়েছে ভুবন। তারপর মাছধরার সকল সরঞ্জাম। পুকুরপাড়ে, ঘরের আশপাশে বহুপুরনো বড় বড় শিশুগাছ ছিল, তাও বেচে দিয়েছে একে একে। গত পাঁচ বছর খেয়ে না-খেয়ে জীবনকে টেনে নিয়ে এনেছে সে এতদূর পর্যন্ত। নিজে না খেয়ে, কম খেয়ে বৃদ্ধ শ্বশুর ও গঙ্গাপদকে ভরাপেটে রাখতে চেয়েছে। প্রতিদিন মাছ যোগাড় করতে পারেনি, ডাল আর পুকুরপাড় থেকে সংগ্রহ করা শাক দিয়ে দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কোনো কোনো দিন বংশীর মা মাছ দিয়েছে। গঙ্গাপদর সেদিনের আনন্দ দেখে কে? মাছ দিয়ে ভাত মেখে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছে গঙ্গা আর ভুবন গভীর দুঃখে পরম মমতায় তা একদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। খেতে খেতে গঙ্গা মুখ তুলে বলেছে, 'মা, আজিয়া তোঁয়ার মাছ রাঁধা খুব হোয়াইদ্যা অইয়ে।'

'খা, অপুত খা। তোর জেডি বংশীর মা আজিয়া মাছ ইউন দিয়ে দে।' ভুবনেশ্বরীর মুখে কৃতজ্ঞতার আভাস ফুটে ওঠে।

'আঁরার হঙ্গিয়াঅল পত্তিদিন নানা রইম্যা মাছ দি ভাত খা, আঁরা পত্তিদিন মাছ দি ভাত খাইন্যুপারি। তুঁই শুধু ডাইল আর শাক রাঁধো।' অভিযোগের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে গঙ্গা।

গঙ্গার কথায় ভুবনের ভেতরটা ভাঙতে থাকে। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'এএন একদিন আছিল, যেতো আঁরঅ উডানত পত্তিদিন মাছ আইতো, নানা রইম্যা মাছ। তোর বাপ কইতো, কী মাছ খাইবা? সেই মাছ পছন্দ হেই মাছ লও। মাছ খাইতে খাইতে মাছের উঅদ্দি ঘিন ধরি যাইতো গই। আর আজিয়া'—বলে থেমে যায় ভুবন। আর কথা বলতে পারে না সে। আবেগে গলা ধরে আসে। চোখের জল ছেলের কাছ থেকে আড়াল করার জন্যে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়।

শ্বশুরবাড়িতে বউ হয়ে আসা অবধি ভুবন দেখেছে তার শ্বশুর সকালবেলা মুখ-হাত ধুয়ে এক থালা পান্তা ভাত খায়। শাশুড়ি রাতের বেঁচে-যাওয়া বাসি তরকারি দিয়ে এক থালা ভাত প্রতি সকালে খেতে দিত। শ্বশুর পিঁড়িতে বসে পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেই ভাত খেতো। শাশুড়ি মারা যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত সে-দায়িত্ব ভুবন পালন করে আসছে। শ্বশুর বুড়ো হয়ে গেছে। খাওয়ার পরিমাণও অনেক কমে গেছে তার। কিন্তু অভ্যেসটি যায়নি। ভুবন প্রতি সকালে থালাটি ভাল করে পরিষ্কার করে অতি যত্নের সঙ্গে শ্বশুরকে পান্তাভাত দেয়। গত বছর খানেক ধরে নিজেরা পেটভর্তি খেয়ে সকালের পান্তাভাত রাখার মতো চাল ভুবন যোগাড়

করতে পারছে না। রাতে নিজে কম খেয়ে শ্বশুরের পান্তাভাতের জন্যে ভাত রেখে দেয় ভুবন।

সংসারের জিনিসপত্র বিক্রি করেও তিনটি প্রাণীর পেটের ভাত যোগাড় করা ভুবনের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। বিক্রি করার মতো ঘরে আর কিছুই নেই। থালা-ঘটি-বাটি-জাল-মাছধরার সরঞ্জামাদি, গাছ-গাছড়া সব ধীরে ধীরে বিক্রি করে দিয়েছে সে। আছে শুধু বসত ভিটেটুকু। এটি বিক্রি করা যাবে না। এই ভিটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে চন্দ্রমণির সকল স্মৃতি। তাছাড়া, ভিটে বিক্রি করে তারা যাবে কোথায়? গঙ্গাপদ দাঁড়াবে কোথায়? এই ভিটে ভুবনের কাছে সোনার চেয়ে দামি।

শ্বশুর ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। ফর্সা রঙ তার। মাথাভর্তি সাদা চুল। দাঁত সবগুলো পড়ে গেছে। মুখে হাজারো বলিরেখা। অনেকদিন দাড়ি কাটেনি। দাড়ি কাটার টাকা বউয়ের কাছে চাইতে লজ্জা করে। কিন্তু খিদে তার সকল লজ্জা ভুলিয়ে দেয়। খিদের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে সে চেঁচায়, 'অ বউ, আঁর তো খুব ভোগ লাইগ্যে। আঁরে কিছু খাইতে দও না।' মরমে মরে যেতে যেতে সে কথাগুলো বলে। সে জানে বউ নিরুপায়। খাবার যোগাড় করার সকল ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু হারামজাদা ক্ষুধা পিছু ছাড়ে না। এসময় মাড়ি দিয়ে জিব চিবোতে থাকে সে।

ভুবন একবাটি মুড়ি শ্বশুরের সামনে রাখে। বলে, 'বাআজিরে, ইক্কিনি অপেক্ষা গর। আঁই ভাত পাআত দি। মুড়ি উ-ন খাইতে খাইতে ভাত অই যাইবো গই।' বলতে বলতে সে ভাঙাচোরা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

এইভাবে একদিন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় ভুবনের। সঞ্চিত মুঠিচাল দিয়ে দুপুরটা কোনোরকমে সামলে নিয়েছে। কিন্তু রাতের খাবার যোগাড় করতে পারলো না সে। সে-রাতে শুধু জল খেয়ে তিনটি প্রাণী কাটিয়ে দিল। সারারাত অঘোরে ঘুমালো গঙ্গাপদ, শ্বশুর কারণে-অকারণে কঁকিয়ে উঠল। নির্ঘুম রাত কাটালো ভুবন। ভোরসকালে বংশীর মায়ের কাছে গিয়ে অনাহারে রাত কাটানোর কথা বললো ভুবন। সের খানেক চাল ভুবনের হাতে দিতে দিতে বংশীর মা বললো, 'এইভাবে তুঁই আর সংসার চালাইত পাইত্যানো। নো খাই নো খাই পোয়া আর হউরগা মরি যাইবো গই। তুঁই এক কাম গর।'

'কি কাম অ বদ্দি?' নিবিড় ঔৎসুক্য নিয়ে ভুবন জিজ্ঞেস করে।

করুণমুখে বংশীর মা বলে, 'তুঁই মাছবিয়ারির কামত লাগি যাও গই। আঁই জানি, বিয়ারিকাম তোঁয়ারলাই নো। ত তো বাঁচি থাওন পড়িবো। পইল্যা পইল্যা তোঁয়াত্তোন খুব খারাপ লাইবো। আঁই তোঁয়ারে শিখাই পড়াই লইয়্যম। তুঁই আর নো শরমাইও। আজিয়া বেইল্যাই তুঁই আঁর লগে দইজ্যার পাড়ত চল। খাড়াং তক্তা বিয়াগ্নিন আঁই তোঁয়ারে দিয়্যম। পরে তুঁই আস্তে আস্তে কিনি লইবা।'

এতগুলো কথা একনাগাড়ে বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো বংশীর মা। তারপরও একটা গভীর তৃপ্তি তার চোখে মুখে। যেন সে নিজের ভীষণ একটা সংকট থেকে মুক্তি পেল এই মুহূর্তে।

ভুবনের সমস্ত মুখে মুক্তির একটা স্পষ্ট ছাপ দেখা গেল।

সোনারঙ ভুবনের, মাথায় দীর্ঘ কালো চুল। গোলগাল মুখে এখনো যৌবনের গাঢ় উপস্থিতি। অনেক ক্লান্তি, অশেষ দারিদ্র্যেও তার চোখের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়নি। সে চোখে দৃঢ় প্রত্যয়—বেঁচে থাকতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে গঙ্গাপদ ও শ্বশুরকে। স্বামী নিখোঁজ হবার পাঁচ বছর পরেও ভুবন বিধবার বেশ ধরেনি। আজও সে রঙিন শাড়ি পরে, শাখা পরে। মন ভাল থাকলে মাঝেমধ্যে কপালে সিঁদুরের টিপ দেয়। অনেকে পরামর্শ দিয়েছে সধবার বেশ ত্যাগ করে বৈধব্য গ্রহণ করতে। তার এরকম বেশবাস দেখে অনেকে আড়ালে আবডালে নিন্দা-মন্দও করে। কিন্তু ভুবন কোনো কিছুকেই আমল দেয় না। তার বিশ্বাস—তার স্বামী চন্দ্রমণি একদিন না একদিন ফিরে আসবেই।

এই বিশ্বাস আগে দৃঢ় ছিল। যত দিন যাচ্ছে বিশ্বাসটা একটু একটু করে নড়বড়ে হতে শুরু করেছে। স্বামী সমুদ্রে নিখোঁজ হলে স্ত্রী বারো বছর সধবা জীবন যাপন করবে। এটা জলদাস-সমাজের নিয়ম। তারপর স্বামী ফেরার সকল আশাকে জলাঞ্জলি দিয়ে, শাখা ভেঙে, কপাল থেকে সিঁদুর মুছে সাদা কাপড় পরবে স্ত্রী। ভুবনও তার স্বামীর ফিরে আসার পথ চেয়ে আছে। এমনি করেই সময় কেটে যাচ্ছে, দাম্পত্যজীবনের স্মৃতি ভুবনের কাছে ধূসর হয়ে আসছে। প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে বর্তমানের দারিদ্র্যময় অসহায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত।

সেদিন বিকেলে বংশীর মা ভুবনদের উঠানে এলো। দেখল, ভুবন আনমনে চুপচাপ বসে আছে। এরকম অবস্থায় ভুবনকে দেখে বংশীর মায়ের ভেতরটা হঠাৎ করে কেঁপে উঠল। এই পরিবারের বউ কোনোদিন বিয়ারির কাজ করবে—এটা স্বপ্নেও ভাবেনি কেউ।

অভাবী পরিবার বলতে যা বোঝায়, ভুবনদের পরিবার তা ছিল না। অনেক বড় উঠান নিয়ে পূর্বমুখী ঘর, একটা ছোট্ট মন্দির, আলাদা পাকঘর, বিশাল পুকুর। পুকুরে নানা জাতের মাছ। নানা জানা-অজানা গাছে পুকুরপাড় ছাওয়া। বাড়ির উত্তরপাশ দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে একটা খাল বয়ে গেছে। খালের পাড়ে নানা ঝোপঝাড়। খালের পাড়ে পাড়ে বড় বড় বাঁশঝাড়। এসব কিছু নিয়ে ভুবনদের পরিবারটি সমীহ আদায় করে নিয়েছিল জেলেপাড়ায়।

হরিবন্ধুর একমাত্র পুত্র ছিল চন্দ্রমণি। কন্যাও একটি, নাম উর্বশী। কাট্টলি বিয়ে হয়েছে তার। যোয়ান হয়ে উঠার পর সংসারের হাল ধরেছিল চন্দ্রমণি। বাবাকে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে দিত না সে। তার শ্রম এবং সংগ্রামে পাঁচজনের সংসারটি বেশ ভালই চলছিল। ভুবন অন্য পাঁচজন জেলে-বউয়ের মতো যখন

তখন যার তার সামনে আসতো না। স্বামী-পুত্র-শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে নিজের বাড়িটির মধ্যে একটা অন্য ভুবন তৈরি করে নিয়েছিল সে। পরিবারে সকল সদস্যের সুখ-দুঃখের প্রতি তার ছিল সজাগ দৃষ্টি।

'অ গঙ্গার মা। চল যাই। নৌকা কুলানর সময় অইয়ে।' বংশীর মায়ের ডাকে ভুবনের সম্বিৎ ফিরে। ধীরে অতি ধীরে সে উঠে দাঁড়ায়। আজ থেকে তার অন্য এক জীবনের শুরু। এ জীবন রূঢ় সংগ্রামের, রক্তঝরা কাঠিন্যের।

বংশীর মায়ের ধার-দেয়া চুপড়ি ও তক্তা নিয়ে ভুবন সমুদ্রের ধারে বেড়িবাঁধের ওপর এসে বসেছে। একটু দূরে ফুলমালার মা, মালতির মা, গুড়াবি ও বংশীর মা নিজেদের মধ্যে আলাপে মগ্ন। ভুবনের মধ্যে অনেক দ্বিধা, অনেক লজ্জা। নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করতে করতে রক্তাক্ত হচ্ছিল সে।

পুরুষবিয়ারিরা ভারে করে মাছ বেচে। ভাইজ্যাবাঁশের চারহাতি একটা ফালাকে ভাল করে চেঁছে বাঁক তৈরি করা হয়। সেই বাঁকের দুই প্রান্তে দুটো চুপড়ি গেঁথে ভার তৈরি করা হয়। বাঁশের চেরা পাতলা ফালা দিয়ে খাড়াং বা চুপড়ি তৈরি করা হয়। প্রতি খাড়াং-এ বিশ-পঁচিশ সের মাছ ধরে। এই দুটো খাড়াং-এর তোড়া আবার একটা দড়ি দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা হয়। জেলেরা মণ-দেড়মণ মাছ ভারে করে অবলীলায় বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু যত অসুবিধা জেলেনিদের। তারা ভার বইতে পারে না। একটা বর্গক্ষেত্রীয় তক্তার ওপর মাছভর্তি একটি খাড়াং বসিয়ে মাথায় করে পাড়ায় পাড়ায় মাছ বেচে তারা। তক্তার কাঠিন্য থেকে মাথাকে বাঁচাবার জন্যে তক্তার নিচে কাপড়ের একটা বিড়া দেয়। খাড়াং থেকে মাছের পানি গড়িয়ে তক্তায় পড়ে। তক্তা থেকে সেই দুর্গন্ধময় পানি জেলেনিদের গায়ে-কাপড়ে পড়তে থাকে। ঘন গাঢ় একটা মেছো-গন্ধ তাদের ঘিরে থাকে সর্বদা।

দরদাম করে ভুবনকে কামিনী বহদ্দারের কাছ থেকে বিশ টাকা দিয়ে এক খাড়াং লইট্যামাছ কিনে দিল বংশীর মা। নিজেও কিনল এক খাড়াং। ভুবন ভাবে না এই মাছ নিয়ে কী করতে হবে। অসহায়ভাবে একবার বংশীর মায়ের দিকে আর একবার ক্রীত মাছের দিকে তাকাচ্ছে সে।

বংশীর মা ভুবনের মনোভাব বুঝতে পেরে বললো, 'ডরাইলে নো অইবো। জাইল্যার মাইয়াপোয়ার কোনো শরম নাই। বাঁচি থাইবারলাই মানুষত্তোন বহুত কিছু গরন পড়ে। আঁরাতো চুরি নো গরির, খানকিগিরি নো গরির। শুধু বাঁচি থাইবারলাই পোয়া-মাইয়ারে বাঁচাই রাইবারলাই মাছ বেচিদ্দে। তুঁই বুগত্ সাহস বাঁধ। বিয়াল্লিন ঠিক অই যাইবো গই।'

বংশীর মায়ের কথাগুলো ভুবনের মধ্যে অন্য একজন ভুবনকে জাগিয়ে তুলল। সে ভুবন সাহসী, সে ভুবন দৃঢ়-প্রত্যয়ী। তার ভেতরের দৃঢ় প্রত্যয় মুখমণ্ডলে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বংশীর মাকে উদ্দেশ্য করে ভুবন বলল, 'বদ্দি, তুঁই আঁরে শিখাই পড়াই লও। আঁরে কয়েকদিন লগে লগে রাখি মাছ কেএন গরি বেচন পড়ে শিখাই দও। আঁরারত্তোন বাঁচি থাওন পরিবো। আঁর পোয়া উয়ারে লেয়াপড়া শিখান পড়িবো।'

বংশীর মা লইট্যামাছ ভর্তি খাড়াংটি তক্তার ওপর বসিয়ে ভুবনের মাথায় তুলে দিল। ভুবন শাড়ির আঁচলকে বিড়া বানিয়ে তক্তার নিচে দিল। মাছের ভারে আর তক্তার কাঠিন্যে ভুবনের মাথা ও ঘাড় টনটন করে উঠল। লইট্যামাছের দুর্গন্ধময় পানি টপাটপ পড়তে লাগল। তক্তা বেয়ে পড়া সে পানি ভুবনের হাত, শরীর ভিজিয়ে দিতে লাগল। ঘাড়-মাথার ব্যথাকে ও মেছোগন্ধময় পানিকে উপেক্ষা করে ভুবন সামনের দিকে পা বাড়ালো। চোখ তার দূরে প্রসারিত। মনে মনে সে বলছে, 'বাঁচি থাওন পড়িবো, বাঁচাই রাওন পড়িবো।'

আমারবই.কম

পাঁচ

'ধুত্তোরার মারে চুদি। অ খানকির পোয়া অল। আঁই তোরার কি ক্ষতি গজ্যি? তোরা আঁর পিছদি লাইগাচ্ দে কিয়ল্যাই?' গালিগুলো গড়গড় করে এক নাগাড়ে দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠেন গৌরাঙ্গ সাধু। এই জৈবিক গালিগুলো দিয়ে গৌরাঙ্গ সাধু নিজেই ভয়ানক অপরাধবোধে আক্রান্ত হন। বিড় বিড় করে বলতে থাকেন, 'হে কৃষ্ণ, আঁরে মাপ গরি দিও। এই জাইল্যার পোয়ামাইয়া অলে আঁর জীবনগানেরে বিষাই তুইল্যে। আঁই আঁর রাগেরে নিজের ভিতর ধরি রাইত নো পারি। আঁই উগ্গা অমানুষ। হেতল্যাই পশুর মত আচরণ গরি।' বলতে বলতে দুই হাত কপালে ঠেকান গৌরাঙ্গ সাধু। মাঝারি সাইজের মানুষ তিনি। বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। পিঠটা একটু বেঁকে গেছে। গৌর বর্ণ। মুখে খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। ভ্রূ কাঁচা পাকা। পাকার সংখ্যাই বেশি। ধারালো নাক। কপাল থেকে নাকের মাথা পর্যন্ত গাঢ় করে তিলকের ফোটা। গলায় তুলসীমালা।

কোঁচানামানো ধুতি পরেন গৌরাঙ্গ সাধু, তার ওপর পাঞ্জাবি চাপান। পাঞ্জাবির দুই পকেটে হোমিওপ্যাথির ওষুধের শিশি। গলায় ঝুলানো মৃদঙ্গ।

মৃদঙ্গ বাজাতে বাজাতে এই গৌরাঙ্গ সাধু জেলে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরেন। বাড়ি তাঁর কাট্টলি হলেও সেখানে তিনি থাকেন না। আজকে হালিশহর, কালকে কুমিরা, পরশু সেলিমপুরের জেলেপাড়ায় দিন কাটে, রাত গুজরান হয়। মৃদঙ্গ বাজাতে বাজাতে তিনি এ-উঠান থেকে ও-উঠানে ঘোরেন। হাঁটতে হাঁটতে মৃদঙ্গের তালে তালে সুর করে গাইতে থাকেন—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।' কিন্তু কোনো জেলেপাড়ার উঠানে উপস্থিত হলেই তার গান থেমে যায়। তখন যাকে সামনে পান, তাকেই সম্বোধন করে বলতে থাকেন, 'অ হরবাঁশি, অ গোলকবিহারী, অ পমিলা, অ অনন্তবালা, তোঁয়ারার পোয়ারে ইস্কুলত্ দিও নি? নো দিলে কালিয়াই ভর্তি গরাই দিও। বিদ্যার মত ধন নাই। টিয়া পইসা চুরি অই

যা গই। জাগাজমি অন্য জনে জোর গরি কাড়ি ল। কিন্তুক বিদ্যা কেউ চুরি গরিত নো পারে, কাড়ি লইত নো পারে। তুঁই জাইল্যাকাম গইত্যা লাইগ্য বুলি তোঁয়ার পোয়া কিয়ল্যাই মাছ মারিবো? আঁরাত্তোন হিন্দু অলর মতো, মুসলমান অলর নান্ লেয়াপড়া গরন পড়িবো। নো অইলে ভবিষ্যতে আঁরার চিহ্ন থাইক্তো নো।'

পরম মমতায় গৌরাঙ্গ সাধু এই প্রয়োজনীয় কথাগুলো বলে বেড়াতে থাকেন। কেউ কেউ গভীর মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথাগুলো শোনে। সাধুর অন্তরঙ্গ কথাবার্তা তাদেরকে ছুঁয়ে যায়। অধিকাংশ জেলে সাধুকে পাগল ভাবে। যেখানে তুলসীগাছ দেখেন, সেখানেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন সাধু। সে-জায়গাটা যদি কাদায় মাখামাখিও হয় বা নোংরা আবর্জনায় পূর্ণ থাকে তাতেও সাধুর ভক্তিতে কোনো হেরফের হয় না।

কারও অসুখ লাগছে শুনলেই পাঞ্জাবির পকেট থেকে শিশি বের করে ওষুধের কয়েকটি বড়ি তার হাতে দেন। বলেন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ গরি খাই ফেলো। ভালা অই যাইবা গই।'

সেই লোকটাই ওষুধ মুখে দিয়ে সুর করে বলে ওঠে, 'অ গৌরাঙ্গ সাধু, তোঁয়ার সামনে কুত্তার গু।'

এই কথা শুনেই সাধু চমকে সামনের দিকে তাকান, দেখেন পথ পরিষ্কার। কিছুই নেই পথে। লোকটার ব্যঙ্গাত্মক রসিকতা বুঝতে পারেন। তখন আর নিজের মধ্যে রাগ ধরে রাখতে পারেন না তিনি। নিজের হাত কামড়াতে কামড়াতে গালিগালাজ শুরু করেন। বলেন, 'এই জাইল্যা মানুষ নো অইবো। যেই জাইল্যা হেই জাইল্যা থাইবো—হারাজীবন, হারা যুগ।'

একসময় রাগ পড়ে এলে আবার নিজ কাজে মনোযোগী হয়ে পড়েন এই লোকটি। মৃদঙ্গে মৃদু তাল তুলে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলতে বলতে জেলেপাড়ার উঠানে উঠানে ঘুরতে থাকেন চিরকুমার গৌরাঙ্গ সাধু। আবার অন্তর্ঘাতী ব্যঙ্গময় রসিকতার শিকার হন, আবার রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে অন্ধ হয়ে যান। আবার জেলেপাড়ায় জেলেপাড়ায় 'বিদ্যা অমূল্য ধন'—এই কথার মর্মার্থ বুঝিয়ে বুঝিয়ে ঘোরেন।

ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে রোদজ্বলা দ্বিপ্রহরে মাছ বেচে বাড়ি ফিরছিল ভুবন। মাথায় তক্তার ওপর মাছের খালি চুপড়িটি বসানো। সকালের কেনামাছ ফেউন্যা পাড়া, ফুলছড়ি পাড়ায় হেঁটে হেঁটে বিক্রি করেছে সে। বিক্রি শেষে সামান্য যা লাভ হয়েছে, তা দিয়ে চাল-ডাল ও আলু কিনে বাড়ি ফিরছিল সে। পথে গৌরাঙ্গ সাধুর সঙ্গে দেখা।

গৌরাঙ্গ সাধুকে দেখেই সে বলল, 'প্রণাম সাধুবাবা।'

এই সাধুর প্রতি ভুবনের অগাধ শ্রদ্ধা। সাধুত্বের জন্যে যেমন, অশিক্ষিত জেলেপাড়ায় বিদ্যার গুরুত্ব উপস্থাপনের জন্যেও তেমনি। ভুবনের প্রণামের

জবাবে সাধু দুহাত তুলে বললেন, 'প্রণাম মা জননী। তুঁই কেএন আছ? তোঁয়ার পোয়া লেয়াপড়া গরের নি?'

ভুবন বলল, 'তোঁয়ার আশিব্বাদে কেলাস ফোরত উইঠ্যে। তুঁই ইক্কিনি আঁর পোয়ারে পরানখুলি আশিব্বাদ গইজ্যো। যেএন লেয়াপড়া গরিত পারে। আঁর কষ্টগান ভুলাই দিত পারে।' বলতে বলতে ভুবনের চোখ বুজে আসে। এই চোখ বোজা সাধুর প্রতি ভক্তিতে না সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে—বোঝা যায় না।

সাধু বললেন, 'তোঁয়ার পোয়া অবশ্যই লেয়াপড়া গরিবো। এই জাইল্যাপাড়ার পইল্যা মেট্রিক পাশ জাইল্যা হইবো। আঁই ঈশ্বরের কাছে হাত তুলি তারলাই আশিব্বাদ চাইর।'

এক পরম তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরল ভুবন। কিন্তু তার এই তৃপ্তি বেশি সময় স্থায়ী হল না। বাড়িতে এসে উঠানে কুলির পাশে মাথা থেকে মাছের খাড়াংটা নামাতে গিয়ে তার চোখ পড়ল বারান্দায়। দেখল—সেখানে একটা পিঁড়িতে মাগইন্যা বসে আছে। তাকে দেখেই ভুবনের মনের তৃপ্তি, স্বপ্নময় অনুভূতি—সবই উবে গেল। জিবটা তেতো হয়ে উঠল। চোখটা রাগে ক্ষোভে দপ্ করে জ্বলে উঠলেও অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করল। বারান্দা থেকে আওয়াজ ভেসে এলো, 'মামী, তুঁই ভালা আছনি?'

ভুবন একবার ভাবল কোনো জবাব দেবে না। কিন্তু আর একবার চিন্তা করল হাজার হলেও ননদের ছেলে, আপন ননদ; দশ মাইল দূরের কাট্টলি থেকে হেঁটে এসেছে। যত বড় অন্যায়ই করুক একটা জবাব দেয়া উচিত। দুর্মর রাগকে চেপে রেখে ভুবন উত্তর দেয়, 'ভালা আছি, তুঁই কেএন আছস্? তোর মা-বাপ ভালা আছেনি?'

কথাগুলো বলতে বলতে চাল-ডালের পুঁটলি ও আলুগুলি নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে যায় ভুবন।

ক্লান্তি ভুবনের শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে। কিন্তু এখন ক্লান্তিকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। শ্বশুর অভুক্ত, ক্ষুধাতুর ছেলে এখনই স্কুল থেকে ফিরবে। ভাগনে বসে আছে অশেষ ক্ষুধা নিয়ে। তাদের জন্যে ভাত তরকারি রাঁধতে হবে।

বাইশ-চব্বিশ বছর বয়স মাগইন্যার। চিপচিপে শরীর। নাকের ডান পাশে মস্তবড় একটা তিল। সামনের ওপর পাটিতে একটা দাঁত না থাকায় তার মুখটা দরজাহীন কুঁড়েঘরের মতো দেখায়। দুচোখে অশেষ ধূর্ততা। কোনোকিছু নিজের অধিকারে আনার জন্যে একটা লুব্ধতা তার দুচোখে খেলা করে। হাঁটুর একটু নিচ পর্যন্ত ধুতি পরা। হাফ-হাতা গেঞ্জি গায়ে। একটা গামছা ভাঁজ করে বাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে সে।

তার প্রকৃত নাম মাগইন্যা নয়, অমৃতলাল। নামটা সুন্দর। স্বভাবটা কুৎসিত। অভ্যেস ভিক্ষুকের মতো। আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে তার পছন্দের কোনো বস্তু দেখলে

সেটা অধিকারে আনার জন্যে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। ওই বস্তুটা পাওয়ার জন্যে মালিকের কাছে প্রথমে ঝুলাঝুলি করে। দিলে ভাল, না দিলে মালিককে না জানিয়ে সে সেটা নিয়ে সরে পড়ে। তার এই স্বভাবের জন্যে আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শিরা তার নাম দিয়েছে মাগইন্যা। এই নামটার তলায় তার আসল নামটা চাপা পড়ে গেছে।

হরিবন্ধুর কন্যা উর্বশীর ছেলে সে। বাড়ি কাট্টলি। মাঝেমধ্যে মামার বাড়িতে বেড়াতে আসে। অকর্মার ঢেঁকি। মা দুবেলা খেতে দিলেও বাপ মোটেও পছন্দ করে না তাকে। কখনো কখনো ক্ষেপে ওঠে বীরেন্দ্র তার ছেলের ওপর। বাপের রুক্ষ রোষ থেকে বাঁচবার জন্যে সে চলে আসে মামার বাড়িতে। দু'চার দশদিন গায়ে বাতাস লাগিয়ে কাটিয়ে দেয়। এপাড়া ওপাড়া ঘোরে। এ-বাড়িতে গিয়ে তামাক খায়, ও-বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দেয়। কিন্তু খাওয়ার সময় হলে দুবেলা যথাসময়ে হাজির থাকে ভুবনের বাড়িতে। তার এ আচরণে মাতামহ হরিবন্ধু রাগ করে না, বরং প্রশ্রয় দেয়। শ্বশুর কষ্ট পাবে বলে ভুবনও তার বিরক্তিকে নিজের মনে চেপে রাখে। কিন্তু গঙ্গাপদ তাকে দুচোখে দেখতে পারে না। বলে, 'চোর চোর, আঁর বাপর হালিশ চুরি গরি লই গেইয়ো গই।'

অভাবের কারণে গত পাঁচ বছরে চন্দ্রমণির ব্যবহৃত মাছধরার প্রায় সকল সরঞ্জাম বিক্রি করে দিয়েছে ভুবন। কিছু কিছু সরঞ্জাম এমনিতেই জরাজীর্ণ হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। চন্দ্রমণির স্মৃতিচিহ্ন বলে প্রায় কিছুই নেই। অনেকদিন পরে সে ঘরের পেছনের চালার নিচে একটা দাঁড় খুঁজে পায়। দেখেই ভুবন চিনলো এটা তার স্বামী যখন সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতো, তখন ব্যবহার করতো। একটি মাছমারা নৌকায় সাধারণত পাঁচজন জলপুত্র থাকে। চারজন দাঁড় টানে; অন্যজন, যাকে এই চারজন মান্য করে, হাল ধরে বসে। সে হালি। নৌকার গতি ও দিক নিয়ন্ত্রণ করে এই হালি। চন্দ্রমণি নৌকা-চালনার দক্ষতার জন্যে জীবনের প্রথম থেকেই হালির সম্মান পেয়ে এসেছে। হাল ধরার সময় সে এই দাঁড় বা হালিশটাকে ব্যবহার করতো। যেদিন সমুদ্রে হারিয়ে যায়, সেদিন তাড়াহুড়ার কারণে হালিশটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল চন্দ্রমণি। তাই এটি বাড়িতে রয়ে গেছে। খুঁজে পাওয়ার পর এই হালিশটা ভুবনের সম্পদে পরিণত হয়। পরম যত্নে সে এই হালিশটা বারান্দায় ঘরের চালের সঙ্গে শ্বশুরকে দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছিল। ঘরে কেউ না থাকলে পরম মমতায় সে এই হালিশটির গায়ে হাত বুলাতো। এইসময় দু'এক ফোটা অশ্রুও গড়িয়ে পড়তো তার কপোল বেয়ে।

গেলো বার, মাস ছয়েক আগে বেড়াতে এসেছিল মাগইন্যা। ছ' সাত দিন থাকার পরে ফিরে যাবার আগের রাতে হরিবন্ধু, গঙ্গাপদ ও মাগইন্যা বারান্দায় পাশাপাশি খেতে বসেছে। ভুবন ভাত-তরকারি পরিবেশন করছে। গোগ্রাসে খাবার গিলছে মাগইন্যা। হঠাৎ করে খাওয়া থামিয়ে সে বলল, 'অ মামী, আঁই কালিয়া যাইতর সমত হালিশাউয়া লই যাইয়্যম গই।'

ভুবন অন্যমনস্ক ছিল। সেভাবেই প্রশ্ন করলো, 'কোন্ হালিশ?'

মাথার ওপরে চালের সঙ্গে বাঁধা হালিশটা দেখিয়ে বলল, ' ঐবা।'

ভুবন তার স্বভাববিরোধী প্রচণ্ড চিৎকার করে বলে উঠল, 'খবদ্দার, এই হালিশ তুই নো ছুবি। লই যাওনতো দূরের কথা।'

মাগইন্যা অবাক হবার ভান করে বলল, 'গঙ্গাপদ এহনো ছোড। হিতে এহনো জালত যাউন্যা নো অয়। আর তুঁই মাইয়াপোয়া মানুষ। তুঁই এত বড় হালিশ দি কী গরিবা? '

হরিবন্ধু দেখল, তার পুত্রবধূর চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। সে-আগুনে ঘৃণা ও তিরস্কার মিলেমিশে একাকার। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে মাগইন্যাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এই হালিশা তুই লই নো যাবি। ইবা আঁর পোয়ার চিহ্ন। আঁর বউয়ে ইবারে যত্ন গরি রাইখ্যে। খবদ্দার, ইবা লই গেইলে বউত অসুবিদা অইব কিন্তুক।'

আমারবই.কম

সে-রাতে আর কথা বাড়ায়নি মাগইন্যা।

সকালে উঠে ভুবন দেখে—মাগইন্যা নাই, চলে গেছে। হালিশটা যেখানে ছিল অনেকটা দৌড়েই সে সেখানে গেল। দেখল—হালিশটা নাই। এক দুর্মর ভয়ংকর আর্তচিৎকার ভুবনের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল।

আমারবই.কম

এই ঘটনার ছয়মাস পরে মাগইন্যা আবার মামাবাড়ি এসেছে।

আমারবই.কম

ফাগুন-চৈত্র-বৈশাখ মাস জেলেদের কাছে বড় আকাল। সমুদ্রে মাছ নেই। দখিনা ঝড়ো বাতাসে সমুদ্র মারমুখী। অধিকাংশ বহদ্দার এসময় মাছমারা বন্ধ করে দেয়। সঞ্চিত টাকা দিয়ে সংসার চালায়। গাঁউরদের বিদায় করে দেয়। ছিঁড়ে যাওয়া জাল তুনে। নৌকা সারায়। গভীর রাত পর্যন্ত জেগে বিহিন্দি ও টং জাল বোনে।

আমারবই.কম

উত্তাল ঢেউকে উপেক্ষা করে বাঁচার তাগিদে কোনো কোনো জেলে এ-সময় সমুদ্রে নৌকা ভাসায়। কিন্তু আশানুরূপ মাছ পায় না। ফলে জলপুত্রদের সংসারে চলে অভাবের টানাপড়েন। বিয়ারিদের অবস্থা এইসময় খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। বহদ্দাররা মাছ ধরতে না পারলে তাদের ওপর নির্ভরশীল বিয়ারিরা অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে। তাদের সংসারে করালগ্রাসী অভাব ঢুকে পড়ে। পুরুষবিয়ারিরা এধার ওধার করে কোনোরকমে সংসার চালায়। নারীবিয়ারিদের জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে। আয়-ইনকাম একেবারে বন্ধ। সঞ্চিত পঞ্চাশ-একশ টাকা অচিরেই ফুরিয়ে যায়। এক ভয়ংকর অভাব তাদের গলা চেপে ধরে। প্রথম দুই-দশ দিন শাকপাতা দিয়ে উনা ভাত খায়। শেষের দিকে নির্জলা উপোস দেয়।

এই সময়ে ভুবনেশ্বরীর অবস্থাও ভাল নয়। হাতে মাত্র বিশটা টাকা পড়ে আছে। শ্বশুর, পুত্র ছাড়াও উটকো ভাগ্নে এসে জুড়ে বসেছে। কবে ফিরে যাবে ঠিক নেই। তার মধ্যে যাওয়ার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। বিশ টাকা দিয়ে

হয়তো আর চার-পাঁচ দিন চালানো যাবে। তারপর? তারপর অন্ধকার। খিদে তাড়িয়ে বেড়াবে গোটা পরিবারকে।

'অ গঙ্গার মা। তুঁই কডে গেলা?' সেদিন সকালবেলা বংশীর মা ভুবনদের উঠানে দাঁড়িয়ে ভুবনকে ডাকছে। ইদানীং সে ভুবনকে গঙ্গার মা বলেই ডাকে। ছেলেমেয়ে বড় হলে জেলেপল্লীতে মানুষের আসল নাম ঘুচে যায়। তখন তারা পরিচিত হয় অমুকের মা, তমুকের বাপ হিসেবে। ভুবনের বেলায়ও তা-ই ঘটেছে। বংশীর মায়ের গলার আওয়াজ বুঝতে পেরে জীর্ণ নুইয়ে-পড়া ঘর থেকে ভুবন বেরিয়ে আসে। বলে, 'বউদ্দিন পরে বদ্দি তুঁই আইলা। এতদিন নো আইও, আঁর ইক্কিনি খোঁজখবর নো লও।'

স্নেহমাখা স্বরে বংশীর মা বলে, 'ইক্কিনি মাইয়ার বাড়িত গেইলাম দে। মাইয়া হউরো বাড়িত এই আকাইল্যা দিনত কেএন গরি কাডার জানিবারলাই মন্‌নান্ বঅর ছটফট গজ্জিল কদিন ধরি। হেতলাই রমারে আর হিতির পোয়াছা উনেরে চাইবারল্যাই গেইলাম দে ঘোড়ামারা। যাক হেই কথা, তুঁই কেএন আছ কও। কেএন গরি সংসার চালাইতা লাইগ্যো?'

নিবিড় কষ্টের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভুবন। চোখের জল লুকাবার জন্যে অন্যদিকে চেয়ে সে বলল, 'খুউব কষ্টরে বদ্দি, খুউব কষ্ট। সংসার আর চালাইত নো পারির। দুইবেলা ঠিকমতো রাঁধিত নো পারির। পোয়ার পরীক্ষার ফিস দিত নো পারির। পোয়ার পড়ালেয়া বুঝি আর চালাইত নো পাইজ্যম।'

একটু থেমে ভুবন আবার বলতে শুরু করে, 'ভাইনা উগ্গা আজিয়া বার-চইদ্য দিন বই বই খার। যাওনর কোনো নাম নাই নুনার দুনা ভাত খা। আঁরা কম খাইলেও মাগইন্যার পাতত্ তো কম দিত নো পারির। ভাত খাইবার সমত হিতে পাতিলের খবর নো রাখে।'

মাগইন্যার কথা উঠতেই বংশীর মায়ের চোখ ধপ্ করে জ্বলে উঠল। গলায় ঝাঁঝ মিশিয়ে বলল, 'তোঁয়ার ভাইনা, কিছু মনে নো গইজ্যো. হিতে তো জাউরগা। হাঁজইন্যার সমত সইফ্যার খামারর চডানত বইএরে মাগইন্যা রামাইয়া, হরবাইশ্যা, রাইমইন্যার লগে গাঁজা খা। আঁর পোয়া বংশী নিজের চোগে দেইখ্যে। তুঁই যত তাড়াতাড়ি পার, হিতারে এত্তুন তাড়াও। নইলে তোঁয়ার বিপদ অইবো।'

বংশীর মায়ের কথাগুলো ভুবন চোখ গোল গোল করে গিলছিল। সে বিশ্বাস করতে পারছে না—মাগইন্যা গাঁজা খায়। আবার বংশীর মায়ের কথাকে অবিশ্বাস করারও কোনো কারণ নেই। বংশীর মা ভিত্তিহীন কথা বলে না। আরও দুই চারটা কথা বলাবলির পর বংশীর মা বিদায় নিল। ভুবন ঠিক করল—শ্বশুর রাগ করলেও মাগইন্যাকে এবার তাড়াতেই হবে।

আজ রোববার। স্কুল বন্ধ। গঙ্গাপদ স্কুলে যায়নি। স্কুলে যেতে ইদানীং তার আর ভাল লাগে না। স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই হিন্দু। হিন্দুছাত্ররা গঙ্গার সঙ্গে ভাল

ব্যবহার করে না। জেলে বলে দূরে সরিয়ে দেয়। এক সঙ্গে বেঞ্চে বসলেও মাঝখানে অনেক দূরত্ব রাখে। দুষ্টু ছেলেরা জাইল্যা, ডোম বলে ঘৃণামিশ্রিত ইয়ার্কি করে তার সঙ্গে। তাদের নিষ্ঠুর আচরণ গঙ্গাকে বিপন্ন করে। তার মুখে প্রতিবাদের ভাষা নেই। যারা তাকে ঘৃণা করে, তারা বেশির ভাগ বর্ণহিন্দু। সমাজ হিন্দুদেরকে মান্যতা দেয়। জেলেরা করুণার পাত্র। ঘৃণা, তিরস্কার তাদের জন্যে সর্বদা তোলা থাকে। এই তিরস্কার ও ঘৃণা পেয়ে পেয়ে গঙ্গা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত উঠে এসেছে। সহপাঠীরা ধীরে ধীরে বড় হয়েছে, লাঞ্ছনার মাত্রাও বেড়ে গেছে সেই অনুপাতে। ফলে বিদ্যালয়, পড়াশোনা গঙ্গার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

তাছাড়া মায়ের নিদারুণ কষ্ট তাকে উন্মত্ত করে তোলে মাঝেমধ্যে। সে লক্ষ করে, মা তাদেরকে থালাভর্তি ভাত দেয়। তাদের খাবার শেষ হলে সামান্য ভাত নিয়ে খেতে বসে। ভাতের প্রায় সবটাই তাদেরকে উজাড় করে দিয়ে সামান্য পরিমাণ ভাত খেয়ে দু'গ্লাস পানি খায় মা। মায়ের পরনের কাপড়ের জীর্ণ দশা দেখলে তার কান্না আসে। মায়ের মাথায় কী দীর্ঘ চুল! কিন্তু কোনোদিন মাকে মাথায় তেল দিতে দেখেনি গঙ্গা। সে কবে থেকে মা চুলের যত্ন নেয়া ছেড়ে দিয়েছে। মায়ের চেহারা আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। তার ফর্সা চামড়া রোদে পুড়ে পুড়ে ফ্যাকাসে হতে শুরু করেছে। মায়ের এই কষ্ট, এই দীন দশা তার সহ্য হয় না। সে ভাবে—যদি দু'চার টাকা সে রোজগার করতে পারতো, তাহলে মায়ের কষ্ট কিছুটা কমতো। কী হবে লেখাপড়া করে? পড়াটা এবার থামিয়েই দিতে হবে।

সেদিন দুপুরে খেতে বসেছে গঙ্গারা। গঙ্গা, দাদু আর মাগইন্যা। ভুবনের মুখে যেন একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ ঝুলে আছে। নীরবে সে তিনটি পাতে ভাত-তরকারি দিয়ে যাচ্ছে। আসুরিক ক্ষুধা নিয়ে গোগ্রাসে ভাত গিলছে মাগইন্যা। তার খাওয়ার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কোনো ভূমিকা ছাড়াই ভুবন জিজ্ঞেস করলো, 'তুই কঁত্তে যাবি মাগইন্যা? আজিয়া আঁইস্যাচ্ দে বার-চইদ্য দিন অই গেইয়্যে গই। তুই কালিয়াই যাবি গই।'

বউয়ের এরকম ঠাস্ ঠাস্ কথা শুনে হরিবন্ধু বেশ অবাক হল। বউতো কোনোদিন মাগইন্যার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে না। নিশ্চয়ই কোনো একটা কারণ আছে। তাই হরিবন্ধু চুপ করে থাকলো।

নানুদা কিছু বলছে না দেখে মাগইন্যা কিছুক্ষণ পর একটু থেমে থেমে বললো, 'কালিয়া যাইয়্যম গই।' তার চোখে মুখে অপমানের জ্বালা ফুটে উঠল।

ভুবনের অবয়ব থেকে ধীরে ধীরে ক্রোধের ভাবটা অপসৃত হয়ে গেল। খাওয়ার প্রায় শেষপর্যায়ে ভুবন তার শ্বশুরের উদ্দেশে বলল, ' বাআজি, তোঁয়ারে এক্কান কথা কইতাম।'

'কি কইবা, কওনা' হরিবন্ধু বলল।

'আঁর ভইনর মাইয়া কুসুমির বিয়া হইয়েদে আজিয়া পেরাই ছ'মাস। বিয়াত যাইত নো পারি। মাইয়াউয়ারে যদি হিতির হউরো বাড়িত্তোন নাইয়র আনিত পাইত্তাম' বলল ভুবন।

'আঁই কি তোঁয়ারে বাধা দিয়্যম না? কোনোদিন বাধা দি না? কঁত্তে আনিবা?'

'মনত উইঠ্যে কইলামদে আরি বাআজি। হাতত্ টিয়া পইসা নাই। হিয়ান ছাড়া কনে আইন্‌তো যাইবো?' অভাবের অসহায়তা ফুটে উঠল ভুবনের চোখে মুখে।

'আঁই যাইয়্যম মামী' হঠাৎ করেই ভুবন ও শ্বশুরের কথার মাঝখানে অতি আগ্রহে বলে ওঠে মাগইন্যা। তার আওয়াজ শুনে ভুবনের রাগ আবার তেড়েফুঁড়ে ওঠে। মুখে ঝামটা দিয়ে বলে, 'তোত্তোন যাওন পইত্তো নো। কালিয়া যাবি গই। আঁরে ইক্কিনি মুক্ত গর।'

এভাবে অপমানিত হয়েও মাগইন্যা আর কথা বাড়ালো না। কিন্তু মুখের পেশিগুলো শক্ত হয়ে উঠল তার। খাওয়া শেষ করে নীরবে উঠে পড়ল সে।

সন্ধ্যেয় সফির খামারের পাশে চওড়া জায়গাটিতে রামাইয়া, হরবাইশ্যা, ব্রজেন্দ্র, রাইমোহন, মাগইন্যা আর অনিল—একে একে এসে জড়ো হল। গত দশবারো দিন ধরে এভাবেই তারা সন্ধ্যের দিকে এখানে জড়ো হচ্ছে। নানারকম শ্রাব্য-অশ্রাব্য প্রসঙ্গে তারা মশগুল হয়ে পড়ে। মাঝেমাঝে পাশের ক্ষেত থেকে তরমুজ চুরি করে আনে একজন। সবাই মিলে সেই চুরি-করা তরমুজ খায়।

সপ্তাহ খানেক আগে থেকে এই আসরে গাঁজা যুক্ত হয়েছে। অনিলই গাঁজার মজা সম্পর্কে ওদের বুঝিয়েছে। প্রথম দিন গাঁজা এনেছেও সে। গাঁজা আনা তার জন্যে সহজ। কারণ, তার বাবা বৈরাগীঢুলি গাঁজাখোর। সন্ধ্যে লাগলেই আনন্দমোহন, ভুইল্যা, ক্ষেত্রমোহন প্রভৃতিকে নিয়ে গাঁজা খেতে বসে যায় বৈরাগী। অনিল তো বাপ্‌কা বেটা। বাপের অনুকরণে এই যুবকটি তার ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে সফির খামারের এই জায়গায় গাঁজার আসর বসাচ্ছে।

আজকেও অনিল গাঁজা এনেছে। সাজানোর পর গাঁজার কল্কি হাতে হাতে ঘুরছে। মাগইন্যার নেয়ার পালা এলে ব্রজেন্দ্র দেখল সে আনমনা, কল্কি নিচ্ছে না।

ব্রজেন্দ্র মাগইন্যাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'অই হালার পোয়া, কী অইয়ে তোর, আঁইস্যচ্ পর্যন্ত কিছু নো কঅর। গাঁজার কল্কিও নো লঅর।'

মাগইন্যা ধীরে ধীরে বলল, ' আজিয়া দুইজ্যা আঁর মামী আঁরে খুব অপমান গইজ্যে।'

'কী অপমান?' অতি আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল রাইমোহন।

মাগইন্যা গাঁজার কল্কিতে জোরে একটা টান দিয়ে আস্তে আস্তে আজকের দুপুরের অপমানের সকল কথা এদেরকে খুলে বলল।

ব্রজেন্দ্র এতক্ষণ চুপচাপ এদের কথা শুনেছে। হঠাৎ করেই সে মাগইন্যাকে জিজ্ঞেস করল,ত্তুই কি এই অপমানর পতিশোধ লতি চাস?'

মাগইন্যার চোখ জ্বলে উঠলো। মুখের পেশি শক্ত হল। সে বলল, 'চাইতো, অবশ্যই চাই।'

তারপর দীর্ঘক্ষণ ধরে সবাই মিলে নিম্নস্বরে পরামর্শ করল। পরামর্শ শেষে ব্রজেন্দ্র বলে উঠল, 'আঁরার কথামত কাম গইল্যে তোর অপমানর জ্বালাও কমিবো আর তোর মামীর বিষও মরিবো।'

রামাইয়া বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনীকে গোল করে ডানহাতের তর্জনী সেখানে ঢুকিয়ে বলল, 'চাইস, মজা খাইবার সমত আঁরার কথা ইক্কিনি মনত গরিচ।' বলেই সে বিশ্রীভাবে চোখ টিপলো।

পরদিন সকালে মাগইন্যা মামাবাড়ি থেকে চুপচাপ বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যের সময় তাকে দেখা গেল ইচাখালির জেলেপাড়ার রেবতীমোহনের উঠানে। হাতে জিলাপিভর্তি মাটির পাতিল। পাতিলের মুখ কাগজ দিয়ে বাঁধা। নৌকার ঘাটেই সে জেনে নিয়েছে রেবতীমোহনের ছেলে বীরেন্দ্রের বাড়ি কোনটা। এই বীরেন্দ্রর সঙ্গেই ভুবনের বোনঝি কুসুমির বিয়ে হয়েছে। উঠানের আবছা অন্ধকারে মাগইন্যাকে দেখতে পেয়ে দাওয়ায় বসা রেবতী জিজ্ঞেস করল, কন্, তুঁই কন্?'

মাগইন্যা ধীরেসুস্থে দাওয়ায় উঠে রেবতীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। বলল, 'আঁই ভুবনেশ্বরী মামীর ভাইনা। তাঁই আঁরে কুসুমিরে নাইয়র লই যাইবারলাই ডিডায়েদে।'

'তোঁয়ারে তো নো চিনলাম'—সন্দিগ্ধ স্বরে রেবতী বলল।

মাগইন্যা ইনিয়ে বিনিয়ে তার পরিচয় দিল। কুসুমির আপন মাসীর আপন ভাগিনা সে। একথা বারবার বলল সে। বুড়া রেবতীমোহন তার গ্রামীণ সরলতার জন্যে মাগইন্যার সকল কথা বিশ্বাস করল। ঘরের ভেতরের দিকে মুখ করে একটু উচ্চস্বরে বলল, 'অ বউ, কন আইস্যে চাও। তোঁয়ার বন্দা লাগে বলে। তোঁয়ারে নাইয়র নিত আইস্যে।'

কুসুমি বেরিয়ে এসে না চেনার দৃষ্টিতে মাগইন্যার দিকে তাকালো। কোনোদিন তাকে দেখেছে বলে কুসুমির মনে পড়ল না। শ্বশুরের আদেশে কুসুমি জিলাপির পাতিলটি ভেতরে নিয়ে গেল।

একটু পরেই বীরেন্দ্র এল বাজার থেকে। রেবতীর কাছে সব কথা শুনে বীরেন্দ্র বলল, 'মনে অন্দে তাঁই কুসুমির বড় অইবো। তইলে তো নোস্বার গরন পড়ের' বলেই সে মাগইন্যার পা ছুঁয়ে নমস্কার করতে গেল।

'ক্ক থাক্' বলে মাগইন্যা পেছনে সরে গেল।

পরদিন দুপুরে ভাত খাওয়ার পর মাগইন্যা কুসুমিকে নিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করল। আরও দু'একদিন থেকে যাওয়ার অনুরোধের জবাবে সে

বলল, 'মামী আঁরারলাই অপেক্ষা গরি থাইবো। আঁরা নো পোঁছন পর্যন্ত ধরফরাইবো। নদীর পথ। যাইতে বউত সময় লাগিবো।'

শেষপর্যন্ত সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার আগেই কুসুমিকে নিয়ে মাগইন্যা এককভাবে ভাড়া-করা নৌকায় করে গন্তব্যের উদ্দেশে রওয়ানা দিল। গোটা নদীপথে কুসুমি জড়সড় হয়ে ঘোমটা মুখে বসে রইলো। মাগইন্যা তার সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইলো নানাভাবে। তার মুখটা পরিপূর্ণভাবে দেখার জন্যে উঁকিঝুঁকি দিল। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও লম্বা ঘোমটা খাটো করল না কুসুমি। নদীর দিকে তাকিয়ে মাগইন্যা ভাবতে লাগল—নারীর রূপ নারিকেলের মালার মত, কখনো আধখানা বৈ পুরো দেখা যায় না।

রাতে মাগইন্যা কুসুমিকে নিয়ে উত্তর পতেঙ্গায় পৌছালো না, পৌছালো কইনপুরার জেলেপাড়ায়। পাড়ায় ঢুকতেই পড়ে রাজবালার ঘর। রাজবালা বিধবা। শণের ছাউনির ঘরটি কোনোরকমে ভিটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মাগইন্যা রাজবালার উঠানে দাঁড়ালো। পেছনে বিবর্ণ কুসুমি। তার মন বলছে—কোনো একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে। মাসির বাড়িতে কোনোদিন যায়নি সে। ফলে জায়গাটা তার অচেনা। কিন্তু রাজবালার উঠানে দাঁড়িয়ে তার মনে হচ্ছে সে ঠিক জায়গায় পৌছেনি। মাসি কই? মেসোতো ভাই গঙ্গাপদ, সে কই?

এই সময় মাগইন্যার কথা কানে এলো তার। সে বলছে, 'হউরো বাড়িত্তোন বউ লইয়েরে নিজের বাড়িত যাওনর সমত পথত রাইত অই গেইয়ে গই। হেতল্যাইবুলি মাসি আজিয়া রাতিয়া তোঁয়ার বাড়িত থাইকতাম চাইর। ইক্কিনি থাইকতা দিবানি?'

কথাটা শুনেই কুসুমির সমস্ত শরীর নিথর হয়ে গেল। মাগইন্যার দুরভিসন্ধি বুঝতে তার বাকি থাকলো না। প্রায় দৌড়েই সে রাজবালার ঘরের ভিতর প্রবেশ করল। তখনো মাগইন্যা উঠানে দাঁড়িয়ে।

বুড়িকে প্রায় হ্যাঁচকা টানে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল কুসুমি। হুহু করে কাঁদতে কাঁদতে রাজবালার পা জড়িয়ে ধরল সে। বলল, ' তুঁই আঁর ধর্মের মা। তুঁই আঁরে বাঁচাও।' বলেই সে চাপাস্বরে কান্না ও ক্রোধমিশ্রিত কণ্ঠে অতিসংক্ষেপে আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল। রাজবালা কুসুমির কথা নীরবে শুনল। কোনো জবাব না দিয়ে সে দাওয়ায় বেরিয়ে এল। সেখান থেকেই বলল, 'অবা। তুঁই ভিতরে আই বইও। এত রাইতত্ কডে যাইবা। কিন্তু বাআজি আঁই বঅর গরিব মানুষ। তোঁয়ারারে কী খাইতাম দিয়্যম বুঝিত নো পারির। বারান্দাত্ উডি তুঁই এই পিড়াআনত বইও। চাই, শান্তির মাত্তোন আজ্ঝের চইল পাইনি।'

মাগইন্যাকে দাওয়ায় বসিয়ে রাজবালা তড়িৎবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে সে ফিরে এলো, সঙ্গে আট-দশজন নানা বয়সের পুরুষ।

মাগইন্যা তো এরকম নীরবে চলে যাওয়ার পাত্র নয়। চৌদ্দ-পনেরো দিন থাকার পর চার-পাঁচবার আকারে ইঙ্গিতে বলার পরেও যাই-যাচ্ছি-যাব করে করে সে আরও দু'চারদিন থেকে যায়। তারপর ঘটা করে বিদায় নিয়ে ঘরের দু'একটা প্রয়োজনীয় দ্রব্য হাতিয়ে সে রওয়ানা দেয় কাট্টলির উদ্দেশে। কিন্তু গত পরশু সে এমনি করে চুপচাপ চলে গেল কেন? ছেলেটা কি তার ব্যবহারে খুব কষ্ট পেয়েছে? নাকি অন্যকোনো খারাপ চিন্তা আছে তার মনে? কথাগুলো বাড়ির পাশের খালে বড়শি বাইতে বাইতে ভাবছিল ভুবন।

ভুবনদের বাড়ির পাশদিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে একটি খাল বয়ে গেছে। জোয়ারের সময় সমুদ্র থেকে পানি ঢোকে এই খালে। সঙ্গে আসে নানা ধরনের মাছ। টেংরা মাছই বেশি। অবসর সময়ে ভুবন, অনন্ত, হরবাইশ্যার মা পাশাপাশি বসে এই খালে বড়শি বায়। আজকেও অনন্ত এবং ভুবন পাশাপাশি বড়শি ফেলেছে। আজকে ভুবন অবসর কাটানোর জন্যে বড়শি বাইছে না। পেটের দায়ে বাইছে। হাতে যা ছিল তার প্রায় সবই গতকালকে খরচ হয়ে গেছে। হাতে চাল কেনার কোনো টাকা নেই। তাই সকাল থেকে সে বড়শি নিয়ে খালের পাড়ে বসেছে। যদি কিছু মাছ পাওয়া যায়, তাহলে তা বিক্রি করে দুপুরের চালটা কেনা যাবে। মাগইন্যার হঠাৎ চলে যাওয়া, চাল যোগাড়ে ব্যর্থতা—এসব কিছু ভুবনের মনকে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে পাশে বসা অনন্তবালাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'অ জগদীশ্যার মা, তোমার মনত আছেনি, একসমত গঙ্গাপদর বাপতারা দইজ্যাত্তোন নৌকা লই এই খালদি বাড়ির ঢাগত চলি আইস্‌তো?'

'অমা, মনত কা নো থাইকতো। জগদীশ্যার বাপ, গঙ্গাপদর বাপ, নিবারইন্যার বাপ যে-সমত একলগে বড়কি মাইত্তো, কতদিন গইন রাইতত্ আইয়েরে ইয়ান্‌দি নাইমতো। খাড়াংভর্তি হাঁওড়মাছ, ঘোড়ামাছ, হোন্দরামাছ লইয়েরে উডানত যাই ডাক দি ঘুম ভাঙাইতো।' বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অনন্তবালা।

'আজিয়া হেই জগদীশ্যার বাপও নাই, হেই গঙ্গার বাপও নাই' বলল ভুবন। কথাগুলো যেন কোন সুদূর থেকে মৃদু বাতাসে ভর করে দীর্ঘ সময় নিয়ে ভেসে এলো অনন্তর কানে। কথাগুলো শুনে অনন্তবালা চোখ তুলে তাকালো ভুবনের দিকে। সে চাহনিতে নিবিড় কষ্ট আর গভীর সমবেদনা ঝরে পড়ছে।

চন্দ্রমণি যে-নৌকায় করে ঝড়োরাতে গভীর সমুদ্রে হারিয়ে যায়, সে-নৌকায় অনন্তবালার স্বামী মহেন্দ্রও ছিল। ফলে ভুবনের জ্বালা সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তবে ভুবনের মতো অনন্তর অভাবের সংসার নয়, তিন ছেলের সবাই আজ আয়-সক্ষম। তাদের আয়ে সংসার ভালই চলছে।

সময় পেলে অনন্ত ভুবনের পাশে মাছ ধরতে বসে। এই বসা মাছ ধরার জন্যে না যতটুকু, ভুবনের দুঃখ নিজের দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্যে তার চেয়ে বেশি।

ওইদিন দুপুরে ভাত খেতে বসেই কথাটা তুলল হরিবন্ধু।

তার মুখে বেশ কদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাঝারি আকারের এই মানুষটি কুঁজো হয়ে গেছে। পুত্র হারানোর জ্বালা তার ভেতরের সমস্ত প্রাণরস শুষে নিয়েছে। চন্দ্রমণি সমুদ্রে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর থেকে হরিবন্ধু একেবারেই চুপচাপ হয়ে গেছে। প্রয়োজন ছাড়া খুব একটা কথা বলে না। একটা নিবিড় উদাসীনতা নিয়ে পুত্রবধূ-নাতি-সংসার ইত্যাদির দিকে তাকায়। কোনো দুঃখ অথবা কোনো আনন্দ আজকাল আর তাকে ছুঁতে পারে না। সংসার-নিস্পৃহ এই মানুষটি সেদিন হঠাৎ করেই কথাটি পাড়ল বউয়ের সামনে। দু'এক লোকমা ভাত মুখে দেবার পর হরিবন্ধু বলল, 'নাতিউয়া হেদিন মনত বঅর দুঃখ লই গেইয়ে। তুঁই হিতারে হেদিন্যা যাইবাল্যাইগই হেএন গরি নো কইলেও চইল্‌তো। আঁর উগ্গামাত্র মাইয়ার পোয়া, বঅর কষ্ট পাইয়ে হেদিন্যা'—থেমে থেমে অনেকক্ষণ ধরে কথাগুলো বলল হরিবন্ধু।

আমারবই.কম

ভুবন কোনো জবাব দিল না। কথা বাড়ালে শ্বশুর কষ্ট পাবে। শ্বশুরকে কোনোভাবেই সে কষ্ট দিতে চায় না। শ্বশুরের কথায় তার অনুশোচনা বাড়ল। ভাবলো—সত্যিই তো মাগইন্যাকে ওইদিন চলে যাওয়ার জন্যে সেভাবে বলা তার উচিত হয়নি। এখন কষ্টে ভিজে যাওয়া শ্বশুরের মনকে স্নিগ্ধ করে তুলতেই হবে। সে বলল, 'ঠিক আছে বাআজি, সামনের বার মাগইন্যা আইলে আঁই হিতাত্তোন মাফ চাই লইয়্যম। এরইম্যা আঁই আর কোনোদিন গইত্তাম নো।'

হরিবন্ধু প্রীতিময় চোখে ভুবনের দিকে তাকালো।

আমারবই.কম

অনেক মানুষের কলরব শুনে মাগইন্যা উঠানে বেরিয়ে এল। আলো আঁধারিতে এতগুলো মানুষ দেখে প্রথমে ঘাবড়ে গেল সে। পরে সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'উ'ন কন্‌?'

রাজবালা সামনে এগিয়ে এসে সজোরে বলল, 'তোর বাপঅল। অলইক্ষাল পুত অলইক্ষা। কুসুমি তোর বিয়া গরা বউ, নো? তোর বাড়ি পঁতিয়া, নো? বাচুইদ্দর পোয়া, পরের মাইয়া ভাগাই আনিএরে নিজের বউ বুলি পরিচয় দেওদ্দে না? '

রাজবালার কথা শেষ হওয়ার আগেই আগত পুরুষরা মার শুরু করে। কেউ কিল, কেউ লাথি, কেউ ঘুষি দিতে লাগল মাইগন্যাকে। প্রথমে সে মৃদু প্রতিবাদ করতে চাইলো। এক তরুণের একটি ঘুষি তার নাক ফাটিয়ে দিল। মারের তোড়ে নিস্তেজ হয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল। পাড়া ভেঙে নারী-পুরুষ-ছেলে-মেয়ে রাজবালার উঠানে ভিড় জমাল। প্রচণ্ড মারের পর তারা ঠিক করল—মাগইন্যাকে দড়ি দিয়ে একটা গাছের সঙ্গে সারারাত বেঁধে রাখা হবে এবং সকালে ইউনিয়ন পরিষদে সোপর্দ করা হবে। আর মেয়েটাকে আগামীকাল তার বাপের বাড়িতে

পৌঁছে দেয়া হবে। অনেকক্ষণ হট্টগোলের পর মাগইন্যাকে দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে আরও দু'চারটা চড়-থাপ্পড় দিয়ে সবাই চলে গেল। রাজবালা কুসুমিকে নিয়ে ঘরে খিল দিল।

ভোরসকালে রাজবালা ঘুম থেকে উঠে দেখে মাগইন্যা পালিয়েছে।

ছয়

চৈত্রসংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখ পাশাপাশি। জেলেরা এ দুটো দিনকে তাদের মতো করে বিশেষভাবে উদ্‌যাপন করে। মুসলমানদের ঈদ ও বর্ণহিন্দুদের দুর্গাপূজার মতো জলপুত্রদের কাছে গঙ্গাপূজা, মনসাপূজা ও চৈত্রসংক্রান্তি সমান গুরুত্ব পেয়ে থাকে। ফাগুন-চৈত্র-বৈশাখ—এই তিন মাসে খাল-বিল-নদী-সমুদ্র জলশস্যশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে জেলেজীবনে নেমে আসে খাদ্যাভাব। এই অভাব চৈত্রের শেষে এমন রূপ নেয় যে, একে দুর্ভিক্ষ বললেও ভুল হবে না। ঘরে ঘরে অন্নাভাবে হাহাকার ওঠে। পুরুষরা কর্মহীন দিন কাটায়, নারীরা জীর্ণকাপড় পরিধান করে আর শীর্ণ হতে থাকে। বাচ্চাকাচ্চারা ক্ষুধার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে ঘন ঘন মায়ের মুখের দিকে তাকায়। এই রকম অভাবের দিনে জেলেজীবনে চৈত্রসংক্রান্তি আসে। ৩১-এ চৈত্রে অনুষ্ঠেয় চৈত্রসংক্রান্তিই জলপুত্রদের জীবনে বেঁচে থাকার প্রাণরস যোগায়।

চৈত্রসংক্রান্তির এক দুই দিন আগে বহুকষ্টে বাঁশের খোপে জমানো এক আনা, দুআনা, চার আনার সমষ্টি স্বামীর হাতে তুলে দেয় জেলেনারীরা। স্বামী সে-টাকা দিয়ে বাজার থেকে সীমবিচি, সিদ্ধচাল, খইয়ের ধান, গুড়, কাঁচা বাদাম কিনে আনে; মায়েরা, ঠাকুমারা, পিসিরা সারারাত জেগে খই-মুড়ি ভাজে, মোয়া-নাড়ু বাঁধে, আটকড়ইয়া বানায়।

চৈত্রসংক্রান্তির একদিন আগে, বিকেলবেলায় গোপালের বউ খুচরা ও কাগুজে নোট মিলিয়ে প্রায় সত্তর টাকা গোপালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বাজারত্ যাও। চৈত্রসংক্রান্তির ছইবিচি, সিদ্ধ চইল আনিবা, আর যা যা লাগে লই আইস্যো।'

গোপাল টাকাগুলো নিতে নিতে বলে, 'কালিয়া তো পাঁচন রাঁধনরও দিন। পাঁচনর তরিতরকারি নো আইন্যম?'

'নো আনিবা না! আননতো পড়িবো। পোয়াছা ঘরত। বছরর শেষে হিতারার মুখত্ ত হাসি ফুডান পড়িবো।' ঘর ঝাড়ু দিতে দিতে স্বামীর দিকে না তাকিয়েই কথাগুলো বলল বকুলবালা।

চৈত্রের শেষদিনে জেলেপাড়ার প্রত্যেক পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে যাকের উপকরণ সংগ্রহে নেমে পড়ে। বেতগাছের আগা, বটের পাতা, পাতাসুদ্ধ আমের ছোট্ট ডাল, কেয়ার ঝোপ, নিমপাতা, থানকুনিপাতা, বাসক

পাতা, কাঁচা বাঁশপাতা ইত্যাদি উঠানের মাঝখানে এনে জড়ো করে। চৈত্রসংক্রান্তির ভোরসকালে প্রত্যেক সন্তানবতী জেলেনি তার সন্তানদের মঙ্গলকামনায় পূর্বমুখী হয়ে ভক্তিভরে সেই স্তূপীকৃত সংগ্রহে আগুন দেয়। একে বলা হয় 'যাক দেয়া।' সকালে উঠেই নারীরা প্রথমে স্নান সেরে নেয়। এরপর সন্তানদেরকে বিছানা থেকে তুলে সেই যাকের পাশে এমনভাবে দাঁড় করায়, যাতে যাকের ধোঁয়া তাদের নাকে-মুখে-গায়ে লাগে। যাকের ধোঁয়া সন্তানদের গায়ে লাগলে তাদের সমস্ত বিপদ আপদ দূরীভূত হয়ে যায়—এটা জেলেনারীদের চিরন্তন বিশ্বাস।

অন্যান্যদের মতো সেদিন ভোরে গঙ্গাপদদের উঠানেও যাকে আগুন দেয়া হয়েছে। যাক থেকে গলগল করে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সেই ধোঁয়ায় ডুবে আছে গঙ্গাপদ। ভুবন উচ্চস্বরে ছড়া কাটছে—

যাকরে যাক, যত আপদ বালাই আছে,
বিয়াগ্নিন হাত দইজ্যা পারই যাক।
যত টিয়া পয়সা ধন দৌলত আছে,
বিয়াগ্নিন আঁর পোয়ার গিদ্দুকত থাক।
যত রোগ বালাই আছে যত শত্রু আছে
বিয়াগ্নিন হাত দইজ্যা পারই যাক।

অভাবী নারীর কণ্ঠ থেকে সন্তানের জন্যে মঙ্গলাকুতি এই ভাবে ঝরে ঝরে পড়তে থাকে। তার সন্তানটি যেন সমস্ত বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকে। সে যেন অনেক সম্পদের অধিকারী হয়ে জীবনটাকে স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে দিতে পারে।

আমারবই.কম

গোপাল সেদিন বিকেলে বাজার থেকে চৈত্রসংক্রান্তির উপকরণাদি কিনে আনল। সন্তান ও স্বামীকে রাতের খাবার খাওয়াতে খাওয়াতে অনেক রাত হয়ে গেল। শরীরে বেশ ক্লান্তি নিয়ে সেই গভীর রাতে খই-মুড়ি ভাজতে বসল বকুলবালা। পাকঘরটা মূলঘর থেকে আলাদা হলেও একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। মূলঘরটিতে ঘুমাচ্ছে গোপাল ও সন্তান দুটো।

খই-মুড়ি, সীমের বিচি, বুট ভাজতে ভাজতে একসময় আনমনা হয়ে পড়েছিল বকুলি। হঠাৎ সে খেয়াল করল রান্নাঘরের দরজায় কে যেন মৃদু টোকা দিচ্ছে।

কে কে করে বাঁশের দরজাটি একটু ফাঁক করতেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল বিজন বহদ্দার।

'বহদ্দার! এত রাতিয়া তুঁই এডে?' চাপা স্বরে কথাগুলো বলল বকুলবালা। তার কথায় উদ্বেগের চেয়ে শিহরণ বেশি।

'তুঁই বুঝিত নো পার? এই, এত রাইতত্ কীঅল্যাই তোঁয়ার কাছে আস্যি। আঁর বুগ্‌গান্ ফাডি যারগই। তুঁই আঁরে ইক্কিনি সুখ দও বকুলি'—কথাগুলো বলতে বলতে বিজন বকুলিকে ঝাপ্‌টে ধরে।

'কীইত্যা লাইগ্যো, কীইত্যা লাইগ্যো'—বলতে বলতে বকুলি বিজনের বুক থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। তবে সে চেষ্টা যে উদ্দীপিত হওয়ারই নামান্তর, ততক্ষণে বিজন বুঝে গেছে। ঝাপ্‌টে ধরে পাকঘরের মেঝেতে শুইয়ে দিল সে বকুলিকে। পাশে চেরাগটি মৃদু আলো ছড়াচ্ছিল। ফুঁ দিয়ে সেটা নিভিয়ে দিল বকুলি।

এই সময় ঘরের ভেতর গোপাল পাশ ফিরে শুলো।

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষাশেষি সমুদ্রে বিহিন্দিজাল ও টংজাল বসাতে হবে। এ জন্যে নানা ধরনের প্রস্তুতির দরকার। ভাইজ্যাবাঁশ লাগবে, গোঁজ লাগবে, লোহার মোটা তার লাগবে। সন্দ্বীপ, হাতিয়া, ধামারখালি, গোমদণ্ডি থেকে গাউর আনতে হবে। যে জেলে-পরিবারে মাছমারার ব্যবসা আছে, সেই পরিবারের প্রতিটি পুরুষকেই এই প্রস্তুতির কাজে নিয়োজিত হতে হয়। এই সকল আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি কিনতে ও গাউর আনতে অনেক টাকার প্রয়োজন। এই প্রস্তুতির টাকা দু'চারজন বহদ্দারের থাকলেও অধিকাংশের নেই। ফলে তারা দাদনদারের কাছে হাত পাতে। উত্তর পতেঙ্গা জেলেপাড়ায় দাদনের ব্যবসা দু'জন ব্যক্তি কুক্ষিগত করে রেখেছে। আবদুস শুক্কুর ও শশিভূষণ রায়। জেলেদের নিয়েই তাদের মহাজনী কারবার। এই দু'জন ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে দাদন নেয়ার উপায় নেই জেলেদের। অন্য দু'চারজন সহজ শর্তে দাদন দিতে চাইলেও শুক্কুর আর শশিরভূষণের কূটকৌশলে শেষপর্যন্ত তারা পিছু হটেছে।

দুটো শর্তে এরা জেলেদের ঋণ দেয়। মাসিক শতকরা দশ টাকা সুদে অথবা যত মাছ ধরা পড়বে, তার সবই দাদনদারের দামে তাদেরই কাছে বিক্রি করতে হবে। জেলেরা নিরুপায়। দু'একটা পরিবার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ধার-উধার করে মাছ ধরার ব্যবসায়ে নামলেও অধিকাংশই শুক্কুর-শশীর ফাঁদে জড়িয়ে যায়। আর একবার তাদের কাছ থেকে যারা ঋণ নেয়, তারা বংশানুক্রমে সে ঋণ থেকে মুক্তি পায় না।

চৈত্রমাসেই বহদ্দাররা ঠিক করে পরবর্তী একবছর কার সঙ্গে কার সহযোগিতার ভিত্তিতে সমুদ্রে জাল বসাবে। এটাকে তারা হাজা বলে। হাজা একটা বাৎসরিক চুক্তি। এই একবছর মাছধরার সকল কাজে একটি নৌকার মালিক আরেক নৌকার মালিককে সর্বান্তকরণে সহযোগিতা দেবে। মৌখিক চুক্তি হলেও এটা অনোঘ, কোনো বহদ্দার এই বাৎসরিক চুক্তি ভাঙতে সাহস পায় না। ভাঙলে সামাজিক বিচারের মাধ্যমে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। চুক্তি ভঙ্গকারীকে একঘরে করে রাখা হয়। মাছমারা থেকে বিরত রাখা হয় তাকে। ফলে চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে সব বহদ্দারই সচেতন।

কিছু জেলে আছে যাদের নৌকা নেই, কিন্তু জাল আছে। সেই জেলেরা নৌকাওয়ালা জেলেদের নৌকায় জাল বসায়। এই ধরনের জেলেকে পাউন্যা নাইয়া বলে। নৌকার মালিকের তিন-চারটি জাল বসানোর অধিকার থাকলেও একটির অধিক জাল পাউন্যা নাইয়া বসাতে পারে না। তারা নৌকাওয়ালা বহদ্দারের করুণার ওপর নির্ভর করে সমুদ্রে মাছ ধরে।

বিজন বহদ্দারের উঠানে বহদ্দার ও পাউন্যা নাইয়াদের বৈঠক বসেছে। আগামী একবছর কে কার সঙ্গে হাজা দেবে আর কে কার পাউন্যা নাইয়া হবে তা ঠিক হবে এই বৈঠকে। পূর্ণচন্দ্র, কামিনীমোহন, বিজনবিহারী, রামনারায়ণ প্রভৃতি বহদ্দাররা বিছানো-পাটির একপাশে বসেছে। অন্যপাশে বসেছে উন্মুখ পাউন্যা নাইয়ারা। পাউন্যা নাইয়াদের ভেতরে চাপা উত্তেজনা, কারো কারো চোখেমুখে উদ্বিগ্নতাও লেপ্টে আছে। কারণ, সব বহদ্দারকে এরা সমানভাবে পছন্দ করে না। দু'একজন বহদ্দার ছাড়া অধিকাংশই মাছমারার মরসুমে শুধু নিজেদের স্বার্থ দেখে, পাউন্যা নাইয়াকে সুযোগ-সুবিধা দিতে গিয়ে নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়। তাদের খাটিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে এরা। এরকম স্বার্থসন্ধানী, লোভী বহদ্দারদের একজন বিজনবিহারী। তার নৌকায় পাউন্যা উঠতে তাই অনেকে নারাজ। ওর নৌকায় পাউন্যা উঠলে লাভের আশা তো দূর অস্ত, বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই বিজন ও তার মতো স্বার্থপর বহদ্দারের নৌকায় পাউন্যা উঠতে হবে বলে নৌকাহীন জলপুত্ররা আজ উদ্বিগ্ন। পাউন্যাদের পাশে বেশ কিছু কৌতূহলী সাধারণ জেলে বসেছে। এরা কেউ মাছবিয়ারি, কেউ গাউর।

বিজনবিহারী কামিনী বহদ্দারকে উদ্দেশ্য করে কথা শুরু করল, 'কী সোহাগীর বাপ, তোঁয়ার গাউর টাউর ধরা হইয়েনি? সেইলাম দে আইজো গোঁজ বাঁশ নো আনো।'

'কে-এ-ন গরি আইন্যম' বিজনবিহারীর কথার শেষাংশ ধরেই কামিনী বলতে লাগল। 'টিয়া পইসা আইজো যোগাড় গরিত নো পারি। ঠিক গজ্যিলাম দে, এইবার শুক্কুইজ্যাত্তোন কজ্জ নো লইয়্যম। বউত চেষ্টা গরিয়েনেও কোনো মিক্কেত্তোন ধার-উধার নো পাইলাম।'

'এহন কীরিবা?' জিজ্ঞেস করে রামনারায়ণ।

কামিনী অত্যন্ত চিন্তান্বিত কণ্ঠে বলল, 'বুঝিত নো পারির। শেষপর্যন্ত শুক্কুজ্যাত্তোনই টিয়া লঅন পড়িবো পাআন্লার।'

'গত বছর টিয়া লইলা। হুজিত পাজ্যিলানি?' জিজ্ঞেস করে কিষ্ট বিয়ারি।

'আর নো কইস্, গত বছরর আঁর রক্তর কামাই বিয়াগ্নুন শুক্কুইজ্যার পেডত গেইয়্যে। গোডা বছরর বেয়াক মাছ হিতে লইয়ে হিতার দামে। টিয়া দওন তো দূরের কথা, বছরর শেষে হিসাব গরি ক'দ্দে আঁত্তোন নাকি আরও দেড়শ টিয়া পাইবো।' কথাগুলো একনাগাড়ে বলে হাঁপিয়ে উঠল কামিনী। তার চোখেমুখে বঞ্চিতের চিহ্ন ফুটে উঠল।

আমারবই.কম

'এই রইম্যা বছর বছর আঁরার লাভর মিডা পিইড়া খাই যারগই। আঁরা কিছুই গরিত নো পারির। কিছু গরনর ক্ষেমতা আঁরাত্তোন নাই।' বলল পূর্ণ বহদ্দার।

ওই বৈঠকে ঠিক হল কে কার সঙ্গে হাজা দেবে। বহদ্দারদের পাউন্যাও নির্ধারিত হল। বিজনবিহারীর পাউন্যা নির্বাচিত হল ঠাকুরদাস। বেজার মুখে সে বাড়ি ফিরল।

বহদ্দার-পাউন্যাদের বাড়িতে বাড়িতে মাছমারার উপকরণাদির যোগাড়যন্তর শুরু হয়ে গেল। দু'তিন জন মিলে মিলে মনোহরখালির বাঁশঘাটা থেকে ভাইজ্যাবাঁশ, গাছের গোঁজ কিনে নিয়ে এল ঠেলাগাড়িতে করে। খালের পাড়ে, উঠানের ধারে বাঁশে বাঁশে ফাঁদা করা চলছে। ওই ফাঁদায় লোহার মোটা তার আটকে গোঁজের সঙ্গে বেঁধে দেয়া হবে। কোনো কোনো বাড়িতে রাতদিন জাল বোনা চলছে। পাউন্যাদের বড় আকারের জাল বসানোর অধিকার নেই। তাই এরা বুনছে সাড়ে বারো কুড়ির ছোট বিহিন্দিজাল। বড় জালগুলো বসাতে পারে শুধু বহদ্দাররা।

পূর্ণ বহদ্দারের তিন ছেলে। তার জাল বোনা, ছেঁড়া জাল তুনা, গোঁজ-বাঁশ-লোহার মোটা তার, ফং, দাঁড়, দড়িদড়া সংগ্রহ শেষ। তার উঠানে নতুন আর পুরনো জালগুলো গাবের পানিতে চুবানো হচ্ছে। ভোরসকাল থেকে পানিভর্তি লোহার ড্রামে গাবগাছের ছাল দিয়ে সিদ্ধ করা হচ্ছে। ঘন্টা দুই সিদ্ধ করার পর পানিগুলো গাবের রসে গাঢ় হয়ে উঠেছে। জালগুলো রাখা হয়েছে কোঁদায়। দশবারো হাতি একটা মোটা গাছের গুঁড়িকে খোদাই করে ছোট্ট নৌকার আকার দেয়া হয়। একে জেলেরা কোঁদা বলে। সেই কোঁদায় শোয়ানো জালের ওপর ড্রাম থেকে গরম গাব বালতি করে ঢালা হচ্ছে। এইভাবে একরাত জালগুলো গাবে চুবিয়ে রাখা হবে। গাবের রসে জালগুলো কালচে রঙ ধারণ করবে। গাবের পানিতে চুবানো জাল টেকসই হয় বলে একজন জেলে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে তার জালগুলোকে গাবের পানিতে এভাবে চুবিয়ে রাখে।

পূর্ণচন্দ্র ভাগ্যবান। তার ছেলেগুলো বেশ সুঠামদেহি। বাপের কথা তারা মেনে চলে। পূর্ণ বহদ্দার করিৎকর্মা লোক। মুখটা তার খুব আল্‌গা। তার মুখ দিয়ে হরদম গালিগালাজ বেরোয়। কারণে অকারণে সে ছেলেদেরকে গালিগালাজ করে; সে বিশ্বাস করে গালমন্দে ছেলেরা নরম থাকে, ভয়ে থাকে। গাবে জাল চুবানোর কাজ করতে করতে তার মুখ দিয়ে খৈ ফুটছিল, 'ও হালার পুত চোদানির পোয়াঅল। বেইন্যাত্তোন কাম গইত্তে গইত্তে জান বাইর অই যারগই। তোরা চোদানির পোয়াঅলেরে জন্ম দিলাম দে কামর সমত সাহায্য পাইবারলাই। তোরা দুইজন ঢাগত্ আছস্, বড় হালার পোয়া কডে?' পাশাপাশি কাজে রত দুই ছেলেকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলে পূর্ণ বহদ্দার।

'বদ্দার বলে অসুখ লাআর, ফুতি রইয়ে'—বললো ছোটছেলেটি।

কথাটি শুনেই রাগ মাথায় চড়লো পূর্ণচন্দ্রের। গতমাসে সে বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছে। আশা ছিল বিয়ের পর বড় ছেলে রামপদ আরও কর্মিৎকর্মা হয়ে উঠবে। কিন্তু আদতে তা হচ্ছে না। সকাল-সন্ধ্যা ঘরের ভিতর থাকে। বউয়ের চারপাশে ঘুরঘুর করে। এটা পূর্ণর অসহ্য। ছেলের এরকম আচরণে সে আগে থেকেই উত্তপ্ত হয়ে আছে। ছোটছেলের কথায় সেই রাগের আগুনে ঘি পড়লো। বলল, 'হালার পোয়াত্তোন কোনো শরমভরম নাই। হুদা বউ লই ফুতনর চিন্তা।'

কথাগুলো পূর্ণ বহদ্দারের বউ ঘরের ভেতর থেকে শুনতে পেল। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পূর্ণর একেবারে কাছে এসে চাপা স্বরে বলল, 'তুঁই ইন কী কইতা লাইগ্য। পরের মাইয়া ঘরত। হুইনল্যে তোঁয়ারে কী ভাবিবো? তুঁই নো হউর?'

কথাগুলোতে বেশ কাজ হল। পূর্ণ চাপাস্বরে গজগজ করতে করতে একসময় চুপ মেরে গেল।

আমারবই.কম

রামনারায়ণ বহদ্দারের নৌকা সারাইয়ের কাজ চলছে সমুদ্রকূলে। গোমদণ্ডি থেকে নৌকা সারাইয়ের মিস্ত্রি এসেছে। এ অঞ্চলে জেলেদের নৌকাগুলোর সবই একগাছি। বহু বছরের পুরনো বৃহৎ কোনো চাপালিশ, গাঁউরি গাছের বাইশ-পঁচিশ হাত কাণ্ড থেকে এই একগাছি নৌকাগুলো তৈরি হয়। গাছটাকে খোদানো হয় প্রথমে। পরে বিশেষ পদ্ধতিতে দক্ষ মিস্ত্রিরা সেই খোদানো গাছটির তলায় মৃদু তাপে আগুন জ্বেলে নানা অংশে কোলতার ঢেলে ধীরে অতি ধীরে ধীরে বাঁকাতে থাকে। বেশ কদিনের চেষ্টায় বাইশ-পঁচিশ হাতের সেই খোদানো কাণ্ডটি নৌকার আকার নেয়। সেই একগাছি নৌকার দুই পাড়ে দেড়হাতি প্রস্থের তক্তা যুক্ত করে নৌকাটিকে পূর্ণতা দেয় মিস্ত্রিরা। এই নৌকাই জলপুত্রদের জীবনতরী, অন্ন সংস্থানের এবং মরণ-বাঁচনের।

রামনারায়ণের নৌকার তলদেশের ইঞ্চি দশেক জায়গায় চিড় ধরেছে। মিস্ত্রি সেই অংশ খোদাই করে সেখানে অন্য তক্তা জুড়ে দিচ্ছে।

এই নৌকার অদূরেই একটা নতুন নৌকা ছ্যাঁকা হচ্ছে। নৌকাটি ধনবাঁশিদের। ধনবাঁশিরা তিন ভাই—ধনবাঁশি, কালাবাঁশি ও ধর্মচরণ। এই বছরেই প্রথম এরা বহদ্দার হিসেবে মাছ ধরায় নামছে। গত ক'বছর নানা বহদ্দারের নৌকায় পাউন্যা নাইয়া হিসেবে জাল বসিয়েছে এই তিন ভাই। বৃদ্ধ গোলকবিহারীর পুত্র এরা। গোলকের বহুদিনের খায়েস ছিল বহদ্দার হবার। কিন্তু নিজের অভাবী জীবনে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ছেলেরা বড় হবার পর ধীরে ধীরে তার মনে পূর্বতন আশা দানা বাঁধতে থাকে। গত বছর বেশ ভাল আয় হয়েছে তার। সেই আয়ের টাকা দিয়ে গোলকবিহারী এই একগাছি নৌকাটি লামুরহাটের রফিক্যা দালালের কাছ থেকে কিনেছে।

আজ সেই নৌকাটিকে ছ্যাঁকা হচ্ছে সমুদ্রপাড়ে। মানুষের কুনজর এড়াবার জন্যে এর চারদিক পাল ও পুরনো তেরপল দিয়ে ঘেরা হয়েছে। বুড়া হলেও গোলকবিহারীর শরীরের পেশি এখনো টান টান। একটা আসুরিক শক্তি যে তার শরীরে জমা আছে—তা দূর থেকে দেখে অনুমান করা যায়। পুত্রদের শারীরিক গঠনও পিতার মতো। তিনপুত্রের শরীরকে যেন পাথর খোদাই করে বানানো হয়েছে।

গোলকের মনে অনেক স্বপ্ন। একদিন বিজন-রামনারায়ণের মতো তাকেও মানুষরা 'বহদ্দার' বলে ডাকবে। বিয়ারিরা সস্তায় মাছ কেনার জন্যে তাকে নানারকম তোষামোদ করবে। একগণ্ডা মতো জায়গায় তার বসতবাড়িটি। সেখানে স্ত্রী-পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূদের নিয়ে আর সংকুলান হচ্ছে না। পারলে এক দুই গণ্ডা জায়গা কিনতে হবে। সেখানে বড় করে একটা ঘর তুলতে হবে।

গোলকবিহারী লতায়-পাতায় ভুবনের শ্বশুর হরিবন্ধুর কি রকম ভাই হয়। উভয় পরিবারে তেমন কোনো সুসম্পর্ক নেই। চন্দ্রমণি মারা যাবার পর সম্পর্কের ফাটলটা আরও বড় হয়েছে।

দেখতে দেখতে জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হয়ে এলো। সমুদ্রে জাল বসানোর সমস্ত প্রস্তুতি শেষ। সব বহদ্দার ও পাউনা নাইয়া প্রস্তুত। চিত্তরঞ্জন শর্মা জেলেদের ব্রাহ্মণ। তিনি জলপুত্রদের পূজা-অর্চনা করান। তিথিনক্ষত্র, জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়েও তাঁর অগাধ জ্ঞান। পঞ্জিকা দেখে তিনি জলযাত্রার দিনক্ষণ ঠিক করে দিয়েছেন। জ্যৈষ্ঠমাসের ২৯ তারিখ যাত্রা শুভ। ঐদিন জলপুত্ররা গভীর সমুদ্রে গিয়ে গোঁজ পুঁতবে সমুদ্রের তলদেশে।

গঙ্গাপূজা সেরেই জেলেরা জাল নিয়ে সমুদ্রে নামে। আষাঢ়ে মা-গঙ্গার পূজা। জলপুত্রদের কাছে মা-গঙ্গা সকল দেবীর সেরা। তিনি মৎস্যদেবী, তিনি তাদের অন্নদাত্রী। এই গঙ্গাপূজায় সকল শ্রেণীর নারী-পুরুষ অংশ গ্রহণ করে।

আজ ৩ আষাঢ়, মঙ্গলবার। আজকেই মা-গঙ্গার পূজার সর্বোত্তম সময়—পঞ্জিকা ঘেঁটে বামুনঠাকুর বলে দিয়েছেন।

সমুদ্রপাড়ে গঙ্গাপূজার আয়োজন করা হয়েছে। পূজার সকল উপকরণ কেনা হয়ে গেছে। সকাল থেকেই বামুনঠাকুর সমুদ্রপাড়ে গঙ্গাপূজা নিয়ে ব্যস্ত। তাঁকে পূজার কাজে পাড়ার কয়েকজন এয়োতি সাহায্য করছে। উত্তরমুখী করে মাটির একটি বেদি তৈরি করা হয়েছে। সেই বেদির ওপর একটা বাচ্চা-কলাগাছ স্থাপন করা হয়েছে। সাগু, কলা, আম-কাঁঠাল, কমলা, আপেল, আখ ইত্যাদি সহকারে কলাপাতার ওপর পূজা সাজানো হয়েছে। কলাগাছের সামনে আরেকটা ছোট্ট বেদির ওপর জলভর্তি মাঝারি আকারের একটি মাটির কলসি রাখা হয়েছে।

কলসির মুখে আম্রপল্লব দিয়েছেন ব্রাহ্মণ, তার ওপর রেখেছেন ডাঁটাসুদ্ধ একটি ঝুনা নারকেল। ধূপ-মোমবাতি জ্বলছে।

জেলেপাড়ার সবাই এসেছে এই পূজামণ্ডপে। আজকের পূজাকে ঘিরে ছেলে-ছোকরাদের আগ্রহ বেশি। কারণ পূজাতে ইয়া বড় একটা পাঁঠা বলি দেয়া হবে। পাঁঠাকে বেশ কিছুক্ষণ আগে স্নান করানো হয়েছে। গলায় পরানো হয়েছে ফুলের মালা। কপালে চন্দনের একটা ফোটাও দিয়েছেন বামুনঠাকুর। যে-কেউ পাঁঠা বলি দিতে পারে না। তার জন্যে দরকার সাহস ও শক্তি। এ-পাড়ার ফেঁজারামের মধ্যে সেই সামর্থ্য আছে। সে জেলেপাড়ার মনসাপূজা ও গঙ্গাপূজায় বলি দিয়ে থাকে। সে এখনো এসে পৌঁছায়নি। ফেঁজারাম এলেই মূল পূজার কাজ শুরু হবে।

বহদ্দাররা নতুন ধুতি পরে চাদর গায়ে দিয়ে পূজামণ্ডপে বিনীত ভাবে বসে আছে। মা-গঙ্গার প্রসন্নতার ওপর তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। তাই মনের সকল কালিমা আজ তারা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। নারীদের গায়েও আজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক। বাচ্চাকাচ্চারাও ভাল জামাকাপড় পরেছে।

ফেঁজারামকে আসতে দেখে পূজামণ্ডপে জমায়েত নরনারীর মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠলো। দোহারা গড়ন ফেঁজারামের। কালো কুচকুচে। মাথার চুলগুলো কোঁকড়ানো। লবণাক্ত জল লেগে লেগে সে-চুল কালত্ব বিসর্জন দিয়ে ধূসর বাদামি রঙ ধারণ করেছে। আজ তার পরনে হাঁটুনামা ধুতি। গলায় একটি গামছা জড়ানো। স্নান করে এসেছে সে, তাই চুলগুলো ভিজাভিজা। চোখে ঢুলুঢুলু ভাব। চোখগুলো ঈষৎ লাল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে—কষে গাঁজা টেনে এসেছে সে। তার কথাগুলো সামান্য জড়িয়ে যাচ্ছে। বামুনঠাকুর তাকে বেদির সামনে বসিয়ে কপালে চন্দনের ফোটা কাটতে কাটতে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন, 'ও গণেশায় নমঃ, ওঁ গঙ্গায় নমঃ ...।'

অদূরে সেই বিশালাকার পাঁঠাটা একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার দু'চোখের নিচে জলের রেখা দেখা যাচ্ছে। পূজামণ্ডপের প্রায় কাছেই হাঁড়িকাঠ তৈরি করা হয়েছে। দেড়হাতি দুটো চৌকো কাঠের টুকরা দিয়ে এটি তৈরি। ব্রাহ্মণের অনুমতি পেয়ে খড়গ হাতে ফেঁজারাম হাঁড়িকাঠের দিকে এগিয়ে গেল। দড়ি থেকে ছাগলটাকে খুলে নিয়ে এলো বিজনের ছেলে শ্যামল। বাচ্চাদের মধ্যে প্রবল গুঞ্জন উঠল। অনিল হাঁড়িকাঠে ছাগলটির গলা ঢুকিয়ে দিল। পেছনের পা দুটো টেনে ধরল শ্যামল।

এই সময় 'জয় মা-গঙ্গা' বলে ফেঁজারাম খড়গ ওপর দিকে তুলল। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে ও নারী হাত দিয়ে চোখ ঢাকল। চোখ খোলার পর তারা দেখল ছাগলের মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। প্রচণ্ড খিঁচুনিতে ধড়টা অস্থির। উপস্থিত জেলে-জেলেনিদের আনন্দধ্বনি, উলুধ্বনি ও হা-হুতাশের শব্দ ঢোল-ডগর-কাঁসা-শানাইয়ের প্রচণ্ড আওয়াজের মধ্যে হারিয়ে গেল।

বালির চরে মাছধরার নৌকাগুলোকে পূর্বমুখী করে সারি বেঁধে রাখা হয়েছে। নৌকাগুলোর সমস্ত গায়ে ঘন কালো আলকাতরা মাখানো। ভিতরেও তাই। কিন্তু নৌকার আগা এবং পাছা বিচিত্র রঙে রঞ্জিত। প্রত্যেক নৌকার আগায় মানুষের দুটো চোখ আঁকা। অনেক কৌশলে সে-চোখ আঁকা হয়েছে। জলপুত্রদের বিশ্বাস—এই চোখ দিয়ে নৌকা গভীর সমুদ্রে তাদের মালিকের জাল খুঁজে নেয়। চোখগুলোর পাশেই 'মা-গঙ্গা, মা-গঙ্গাদেবী পদেসু' ইত্যাদি কথাংশ লেখা। পাছার দিকে নানা ফুল-পাতা আঁকা। তারই ফাঁকে ফাঁকে নৌকার মালিকের নাম লেখা। সবই অদক্ষ হাতের কাজ। সবকিছু মিলে প্রত্যেকটি নৌকার আলাদা আলাদা বিশেষত্ব।

আজ সে-নৌকাগুলোর প্রত্যেকটির আগায় একটা করে কচি কলাগাছ বসিয়ে দেয়া হয়েছে। পূজা শেষে বিজনের বউ শান্তিবালা, রামনারায়ণের বউ রাধারানী, পূর্ণ বহদ্দারের পুত্রবধূ স্বরবালা এবং অন্য দু'জন এয়োতি কুলার আগায় মাটির পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে সেখানে সিঁদুরের কৌটা রেখে নৌকাগুলোর কাছে গেল। উলুধ্বনি সহযোগে সিঁদুর কৌটা থেকে ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে সিঁদুর নিয়ে নৌকাগুলোর আগায় টিপ দিতে লাগল তারা। আর কপালে হাত ঠেকিয়ে সুর করে বলতে লাগল, 'অ মা-গঙ্গা, তুঁই আঁরার মিক্কে ইক্কিনি ফিরি চাইও। তুঁই আঁরার জীবন, তুঁই আঁরার মরণ, তুঁই দয়া গরি আঁরার জামাইরে বেশি মাছ নো দিলে পোয়াছা লই উয়াস থাইক্যম। মা-গঙ্গা, আঁরারে দয়া গইজ্যো। আইয়েন্দে বছর যেএন আঁরা আবার এই রইম্যা গরি তোঁয়ার পূজা দিত্ পারি।'

জেলেসমাজে ক্ষুদ্রতার অভাব নেই, পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ এই সমাজকে চারদিকে থেকে ঘিরে-বেড়ে রেখেছে। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে এই সমাজে দলাদলিও যে হয় না, এমন না। তবুও একধরনের ভালবাসার বন্ধন এদেরকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে। সহস্র রকমের ক্ষুদ্রতা, দলাদলি, ঈর্ষা-দ্বেষ সত্ত্বেও গঙ্গাপূজা-মনসাপূজার মতো উৎসব, যা আনন্দেরই নামান্তর, তাদেরকে স্নেহবন্ধনে বেঁধে রেখেছে।

সাত

চন্দ্রমণি সমুদ্রে নিখোঁজ হওয়ার বার বছর পূর্ণ হচ্ছে আজ। ভোরসকালে উঠে ভুবন উঠানের মাঝখানে একফালি জায়গা ভাল করে ঝাঁট দিয়েছে। ময়নামাটির সঙ্গে গোবর মিশিয়ে জায়গাটা উত্তমরূপে লেপন করেছে সে। আজ এখানে ব্রাহ্মণ পূজা করবে। ভুবনের বৈধব্যবরণের পূজা।

স্বামী সমুদ্রে হারিয়ে গেলে জেলেনিরা আশায় আশায় দিন গোনে। স্বামী মরেনি, ঝড়ে দূর-সমুদ্রে ভেসে গেছে, হয়তো একদিন পথ চিনে চিনে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আবার সে স্ত্রী-সন্তানদের সংসারে ফিরে আসবে—এই আশা নিয়ে

জেলেপত্নীরা দিন ফুরায়, রাত কাটায়। ভেতরে সব হারানোর বেদনা নিয়ে বাইরে সধবার বেশ ধারণ করে থাকে তারা। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে।

বার বছর পর সধবার সকল বেশ—শাঁখা, সিঁদুর, রঙিন শাড়ি সব ত্যাগ করে পাড়হীন সাদা ধুতি পরিধান করতে হবে। এটাই জেলেসমাজের অলিখিত অথচ স্বীকৃত প্রথা। আজ ভুবনের স্বামীহারা জীবনের বার বছর পূর্তির দিন।

ব্রাহ্মণ পূজা করে চলে গেছে। উঠানে পূজার স্থানে সাগু-চিনি-খইয়ের কিছু অংশ পড়ে আছে। ও-গুলোকে ঘিরে কাকদের ভিড়। বংশীর মা, ফুলমালার মা, মালতি, গুড়াবিরা এসেছিল; কিছু গুড়াগুর্বাও এসে ভিড় করেছিল নৈবেদ্য খাওয়ার লোভে। এখন সবাই চলে গেছে। শ্বশুর উঠানের এককোনে আমগাছ তলায় কুঁজো হয়ে বসে আছে। চোখের নিচে জলের গভীর দাগ। গঙ্গা নেই, স্থলে গেছে।

কা-কা করছে উঠান, খা-খা করছে ভুবনের হৃদয়। দাওয়ায় পিঁড়ির ওপর চুপচাপ বসে আছে সে। পরনে ধুতি, কপালে সিঁদুর নেই, পূজার স্থানে হাতের শাঁখা ভেঙেছে। পূজাতে বসার আগে নাপিত ডেকে মাথার সেই ঘনকালো দীঘল চুল কেটে ছোট করে ফেলেছে।

বিয়ের সময়ও ভুবনের মাথায় ঘনকালো লম্বা চুল ছিল। গঙ্গার বাপ বহুবার সেই চুলের প্রশংসা করেছে। বাজার থেকে ভালো নারকেল তেল এনে দিয়েছে চুলের পরিচর্যার জন্যে। সেই থেকে এই চুলের প্রতি ভুবন এক গভীর মমতা পোষণ করে আসছে। আজ চুল কাটার সময় ভুবনের মনটা একটুক্ষণের জন্যেও বিচলিত হয়নি। ভেবেছে—যে এই চুলকে পছন্দ করতো, সে নেই; সুতরাং এই চুলের প্রতি মমতা পোষণ করার দরকার কি?

দীর্ঘ চুলহীন, শাঁখা-সিঁদুর বিহীন, ধুতিপরা এক নতুন জীবন শুরু হল আজ ভুবনের।

কূল থেকে মাইল দুয়েক দূরের সমুদ্রে জেলেরা জাল বসায়। বিহিন্দিজাল—সারি সারি। ওইখানেই বঙ্গোপসাগরের খাঁড়ি। খাঁড়িতে স্রোত বেশি, মাছও বেশি। দশ-বারোজন বহদ্দার পাউন্যা নাইয়াসহ পূর্ব থেকে পশ্চিমে সারি করে জাল বসায়। জেলেরা জাল পাতানোর এই সারিকে পাতা বা বেতা বলে। এক এক নৌকাতে করে সাধারণত বহদ্দারের তিনটি এবং পাউন্যার একটি মোট চারটি জাল বসানো হয়। নৌকা ও জালের সংখ্যা বেশি বলে এক পাতায় উত্তর পতেঙ্গার সব জেলে জাল বসাতে পারে না; এক পাতার উজানে বা ভাটিতে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে অন্য পাতার স্থান নির্ধারিত হয়। নির্ধারণ করে মৎস্যজীবী জেলেরাই, সলাপরামর্শের মাধ্যমে।

গৌজ পোঁতা ও জাল পাতানোর কাজ শেষ। এখন জেলেরা জোয়ার-ভাটা হিসেব করে জাল থেকে মাছ তুলতে যায়। এখন সমুদ্র উত্তাল। আষাঢ়-শ্রাবণের সমুদ্র ঝড়ো-হাওয়ায় আর বৃষ্টির দাপাদাপিতে মারমুখী হয়ে উঠছে। এই ঝড়-ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে মাছ ধরতে যাচ্ছে জেলেরা।

জালের উদ্দেশে কূল থেকে সোজাসুজি পাড়ি দেয়া যায় না। দাঁড়ের নৌকা; বাতাস অনুকূলে থাকলে পালের টানে নৌকার গতি বাড়ে। তারপরও কিনারা ঘেঁষে মাইল খানেক উত্তর অথবা দক্ষিণে নৌকা ঠেলে নিয়ে যেতে হয়। তারপর দাঁড়ে-পালে পাড়ি দিতে হয়। পাতায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে স্রোতের টান কমে আসে, জাল ভেসে ওঠে। সর্বসাকুল্যে আধঘণ্টার মতো জাল ভেসে থাকে জলের ওপর। এর মধ্যেই জালের ছঅরি থেকে মাছ তুলে নিতে হয় নৌকায়। তারপর জলে স্রোতের টান আসে। স্রোতের টানে জাল নেমে যায় সমুদ্রের তলায়। সবাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাল থেকে মাছ তুলে নিতে পারে না। তখন খালি হাতে বাড়ি ফিরে তারা।

আমারবই.কম

আজ সমুদ্রে আঁধার করে বৃষ্টি নেমেছে। দমকা দমকা বাতাস বইছে। আগোছালো ঢেউ এধার ওধার ভেঙে পড়ছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে সংঘর্ষে গোটা সমুদ্র ফেনাময় হয়ে উঠেছে। কখনো কখনো এলোমেলো ঢেউকে থামিয়ে দিয়ে পাহাড়-সমান ঢেউ হা-হা করে ছুটে আসছে। এসব কিছুকে উপেক্ষা করে উত্তর পতেঙ্গার জলপুত্ররা পাড়ি দিয়েছে পাতার উদ্দেশে।

আমারবই.কম

এই ক্ষুধার্ত হুংকারময় সমুদ্রে তাদের ছেলেদেরকে একা যেতে দিতে রাজি নয় পূর্ণচন্দ্র ও গোলকবিহারী। তাই আজ তারা সন্তানদের সঙ্গে চলেছে। জীর্ণ শরীরের শক্ত মুঠোয় বৈঠা ধরেছে তারা। উভয়ের নৌকায় গাউর এবং ছেলেরা দাঁড় টানছে। দুইজন ভিন্ন ভিন্ন পাতায় যাবে। খাল থেকে বেরুলেই রাক্ষুসে সমুদ্র। খালে পাশাপাশি চলছে দুটো নৌকা।

আমারবই.কম

পূর্ণ বলল, 'গত কালিয়া তোঁয়াত্তোন মাছ কেএন পইজ্যে ধনবাইশ্যার বাপ?'

পূর্ণচন্দ্র পুরনো বহদ্দার। সে কখনো গোলকবিহারীকে বহদ্দারের মর্যাদা দিতে রাজি নয়। সেজন্যে গোলকবিহারীকে 'বহদ্দার' বলে না, বলে 'ধনবাইশ্যার বাপ।

'কালিয়া জালর কাম গরিত নো পারে। পোয়াঅল যাইতে যাইতে হোঁতর টানে জাল পানির নিচে গেইল গই। হেতল্যাই আজিয়া আঁই যাইন্দে হিতারার লগে।' উঁচুগলায় কথাগুলো বলল গোলকবিহারী।

'আজিয়া দইজ্যার অবস্থা দেইখ্যনি? তুয়ানর মতিগতি বঅর বেদিশা লাআর।' চিন্তিতকণ্ঠে বলে পূর্ণচন্দ্র।

'তঅত যাওন পড়িবো। নো গেইলে পেট চলিবো কেএন গরি। দুই এক জোআর মাছ অঁত্তর অই গেলে মাছঅ পঁচিবো জালও ফাডিবো'—বলল গোলক।

এর মধ্যেই নৌকাগুলো খালের মুখে এসে গেছে। সব নৌকা থেকে দু'জন করে গাউর ঝুপ্‌ঝাপ্‌ কোমর-পানিতে নেমে গেল। নৌকা ঠেলে নিয়ে যেতে হবে মাইল খানেক দক্ষিণে। তারপরই পাতার উদ্দেশে রওয়ানা দেয়া যাবে।

বার-চৌদ্দটি নৌকা সমুদ্রের বুক চিরে এগিয়ে যাচ্ছে। ভরা পাল। পালের টানে নৌকাগুলো একদিকে কাত হয়ে গেছে। দাঁড়িরা দাঁড় টানা বন্ধ রেখে নৌকার উঁচু-পাড়ে চেপে বসেছে। তারপরও কাত-হওয়া পাড় দিয়ে ঝলকে ঝলকে পানি ঢুকছে নৌকায়। সেঁচনি দিয়ে অবিরাম পানি সেঁচে যাচ্ছে একজন। সে ক্লান্ত হয়ে পড়লে অন্যজন এগিয়ে আসছে। মাঝেমধ্যে নৌকার আগায় পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ ভেঙে পড়ছে। হালে বসে মাঝিরা দাঁড়িদের সাহস যুগিয়ে যাচ্ছে, 'ডরাওর না? নো ডরাইস্‌। মা-গঙ্গা আছে। কিছু নো অইবো। বুগত্‌ সাহস রাখ।'

এইমাত্র একটা বিরাট ঢেউ প্রবল হুংকারে পূর্ণচন্দ্রের নৌকার মাথায় আছড়ে পড়লো। ভরাপালের নৌকা টালমাটাল করে উঠল। মেজছেলে নৌকার পাড় থেকে ভেতরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। শক্ত মুঠিতে হাল ধরে ডুবো-ডুবো নৌকা বাঁচাতে বাঁচাতে পূর্ণ চেঁচিয়ে উঠল, 'চনু ধরি বই রইস দে না। পড়ি কা গেইয়স গই। কলবাঁশ ধরি শক্ত গরি ব। মা-গঙ্গা মা-গঙ্গা ক বিয়াগুনে। অ হালার পোয়া গবিন্দইয়া। তোর চোখ মুখ এন গরি ভেডাইকা গেইয়ে গই। পানি নো হেঁচি চনুর মিক্কে চাই রইয়স দে না?' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেল পূর্ণ। সমুদ্রের ভয়াল রূপ দেখে ভেতরে ভেতরে পূর্ণ একটু ঘাবড়ে গেলেও তা প্রকাশ করল না। তার ধমকানি শুনে গোবিন্দ গাউর জোরেসোরে পানি সেঁচা শুরু করল।

আর ছেলেরা 'দোয়াই, মা-গঙ্গার দোয়াই' বলতে লাগল।

নৌকা পাতায় পৌঁছে গেছে। জালগুলো ভেসে উঠতে শুরু করেছে। পূর্ণর ছেলেরা জাল থেকে মাছ তুলতে দক্ষ। অল্পসময়ের মধ্যে তারা জাল থেকে মাছগুলো তুলে নিল নৌকায়। লইট্যা, শাঙ্কা, বুয়াল, [illegible] খোল ভরে গেল। মাছগুলো দেখে এই দুঃসহ ঝড়-জলেও পূর্ণচন্দ্রের মুখে একটা নিবিড় প্রশান্তি উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল।

নৌকাগুলো একের পর এক কূলে ভিড়তে শুরু করেছে। সব নৌকা অক্ষত অবস্থায় ফিরতে পারেনি। কোনো নৌকার পালের বাঁশ ভেঙেছে। কোনোটার দাঁড় ভেঙে সমুদ্রে ভেসে গেছে। কোনোটার মাস্তুল ভেঙে একাকার। সব নৌকা আবার মাছ নিয়েও ফিরতে পারেনি। পাতায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে জাল পানির নিচে চলে গেছে স্রোতের টানে। আবার কোনো নৌকার জাল ফেঁসে গেছে।

কূলে বিয়ারিদের ভিড়। পুরুষবিয়ারিরা হাঁকাহাঁকি করছে। মেয়েবিয়ারিরা নীরবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ-নৌকা থেকে ও-নৌকায়। মাছ খোঁজন্যা পোলারা নৌকার পাশে পাশে দাঁড়িয়ে নামতা পড়ার মতো বলে যাচ্ছে, 'অ বদ্দা। অ জেডা, অ

মামা, আঁরে দুয়া মাছ দও না। ' কেউ এক খাবলা মাছ তাদের ছোট্ট চুপড়িতে তুলে দিচ্ছে। আবার কেউ যা-যা দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

কামিনী বহদ্দারের নৌকার পাশে হঠাৎ হৈচৈ শোনা গেল। হাতের কাজ ফেলে কেউ কেউ দ্রুত ওদিকে যাচ্ছে। কেউ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেদিকে।

দাদনদার শুক্কুইজ্যা কামিনী বহদ্দারের গালে চড় মেরেছে।

কামিনী এবছরও শুক্কুরের কাছ থেকে দাদন নিয়েছিল। কথা ছিল—বাজার দরে সে কামিনীর কাছ থেকে মাছ কিনবে। আজ কামিনীর জালে লাম্বুমাছের ঝাঁক পড়েছে। সেই মাছ পানির দামে নিয়ে যেতে চায় আবদুস শুক্কুর। কামিনী সে-দামে মাছ বিক্রি করতে নারাজ। কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে কষে চড় মেরেছে শুক্কুইজ্যা কামিনীর গালে। ঝড়-জল ও সমুদ্রের ঝাপটায় মৃতপ্রায় কামিনী বালিতে ঘুরে পড়ে গেছে। কামিনী বহদ্দার নিঃসন্তান পাড়ারা ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ণ, বিজন, গোলক, রামনারায়ণ বহদ্দার এগিয়ে এসেছে।

চড় দেয়ার পরও শুক্কুর বলে চলেছে, 'খানকির পোয়া, ডোমর বাইচ্যা, টিয়া লইতর সমত হুস্ নো আছিল? বাপেরে মাছ দওনর কথা ভুলি গেইয়স্ দে না? আজিয়া ভালা মাছ বাইজ্যে আর আঁরে মাছ নো দি বিয়ারির কাছে বেচি ফেলিবারলাই চাওদ্দে কিল্লাই?'

'মাছ তো তোঁয়ার কাছে বাজার দামে বেচনর কথা, তুঁই তো তোঁয়ার ইচ্ছা মতন দাম দিতা চাইতা লাইগ্য'—শরীর থেকে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে কাঁদোকাঁদো স্বরে কথাগুলো বলল কামিনী।

'কথা নো কইস্ চোদানির পোয়া, মালাউনের জাত। আঁই যেই রইম্যা দাম দিয়্যম, হেই দামে বেচিবি দে'—উচ্চকণ্ঠে বললো শুক্কুর।

'হেই দামে বেইচতো নো'—পেছন থেকে বজ্রকণ্ঠে হুংকার দিল বিজন বহদ্দার। 'বাজারদরে তোঁয়াত্তোন মাছ কিনন পাড়িবো। নো অইলে মাছ তোঁয়ার কাছে বেইচ্তো নো।'

'তুঁই ক'ন, তোঁয়াত্তোন মাছ লই না? তুঁই কা মইধান্দি পড়ি মাইত্যা লাইগ্য, তোঁয়ার কামত তুঁই যাও'—ধমকের সুরে বিজনের উদ্দেশে বলল শুক্কুর।

'কামিনী বহদ্দাররে রক্ষা গরন আঁরার কাম।'—সমস্বরে সকল বহদ্দার বলল।

'খবদ্দার আর কোনোদিন যদি কামিনী বহদ্দার অথবা অন্যকোনো জাইল্যার গাআত হাত তোল, তইলে হেই হাত আঁরা বেয়াগ্গুনে ছেঁচি দিয়্যম'—দৃঢ়স্বরে রামনারায়ণ বলল।

সব বহদ্দারকে একসুরে কথা বলতে দেখে শুক্কুর একটু দমে গেল। সেই সময় যেখানে উপস্থিত হল শশিভূষণ মহাজন। সব কথা শুনে শুক্কুরকে ধমকের সুরে বলল, 'শুক্কুর মিয়া তুঁই ই'ন কিইল্যা, জাইল্যার গাআত হাত? ঠিক নো গর।

হিতারার কারণে আঁরার বেবসা। তুঁই হিতারারে অপমান গরি পাপের কাম গইজ্যো'—বলতে বলতে কামিনীর গায়ে ও মাথায় হাত বুলাতে লাগল ষাটোত্তর শশিভূষণ।

কামিনীকে উদ্দেশ্য করে শশিভূষণ বলল, 'শুক্কুরর অইয়েরে আঁই তোঁয়ার কাছে মাফ চাইর। তুঁই মাফ গরি দও। শুক্কুর মিয়া, কামিনীর দামেই আজিয়া তুঁই মাছ কিনিবা। আরেকদিন তোঁয়ার দামে কিন্য।'

শুক্কুর নীরব রইল। তার চোখে মুখে লজ্জার কোনো লক্ষণ ফুটে উঠল না। তবে সে বুঝতে পারলো, এটা শশিভূষণ মহাজনের চাল। জেলেদের না ক্ষেপিয়ে শোষণ করার চালটি বুঝতে তার দেরি হল না।

বহদ্দার ও অন্যান্য জেলেরা যার যার জায়গায় ফিরে গেল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। রামনারায়ণ বহদ্দারের দাওয়ায় সব বহদ্দার ও পাউন্যা নাইয়া একত্রিত হয়েছে। আজকের ঘটনার একটা বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আজকে শুক্কুর মিয়া কামিনী বহদ্দারকে মেরেছে। কালকে আরেক জনকে অপমান করবে। তার হাতের শরম ভেঙে গেছে। একটা প্রতিরোধ গড়ে না তুললে পরবর্তীকালে সে আরও মারমুখী হয়ে উঠবে। আজকে শুক্কুর, কালকে শশিভূষণ, পরশু অন্য কেউ তাদেরকে পিষ্ট করবে। এটা হতে দেয়া যায় না।

'আজিয়ার ঘটনার এক্খান বিহিত গরন দরকার। নইলে আঁরারে একদিন পিসি খাই ফেলাইবো ইতারা'—অঝোর ধারায় ঝরে-পড়া বৃষ্টির দিকে চোখ রেখে কথাগুলো বলল রামনারায়ণ। তার কথার সঙ্গে নিবিড় কষ্ট ও ক্ষোভ মিশে আছে।

'আঁর পেরাই দুই কুড়ি দশ বছর বয়স অর। কোনোদিন আঁই কিআর ক্ষতি নো গরি। আজিয়া ঈশ্বরে আঁর কোয়ালত এই অপমান লেখি রাখ্যিল'—বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল কামিনী।

গোকুলবাঁশি একজন পাউন্যা মাইয়া। সে পেছন থেকে দৃঢ়স্বরে বলল, 'এই অপমানর পতিশোধ লওন পড়িবো।'

'কিন্তু কেএন গরি লইবা? হিতারা আঁরারে কারণে অকারণে গালিগালাজ গরে, কি বলে আঁরা মালাউন। হে কথার অর্থ কী কনে জানে, গাইল পাআন্লার। আজিয়া গাইল, কালিয়া মাইর, পরশু ভিঁডাবাড়ি লই টানাটানি। এখনোত্তোন সাবধান নো অইলে ভবিষ্যতে আঁরার আরও বিপদ অইবো'—কথাগুলো বলে বিজন সবার দিকে তাকালো।

সমবেত জলপুত্ররা সমস্বরে বলল, 'আঁরা বেয়াগ্গুনে ঠিগ আছি। তুঁই যা কইবা হিয়ান আঁরা মাইন্যম।'

আরও অনেক সলাপরামর্শের পর ঠিক হল—যারা শুক্কুর ও শশিভূষণের কাছ থেকে দাদন নিয়েছে, তারা আগামীকাল থেকে তাদের কাছে মাছ বেচবে বাজার দরে।

মহাজনদের মনগড়া দরে মাছ বেচবে না। এজন্যে কোনো অঘটন ঘটলে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে তার প্রতিরোধ করবে। কামিনী এবং অন্যান্য ঋণগ্রহীতাদের দাদনের টাকা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিশোধ করে দিতে পরামর্শ দেয়া হল।

ফেউন্যাপাড়া, ফুলছড়িপাড়া, হিন্দুপাড়া, নাপিতপাড়ার গলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে সারাটা সকাল মাছ বেচেছে ভুবন। আজকে তার কেনা মাছগুলো তাজা ছিল না। ফলে বিক্রি করতে অনেক দিকদারি পোহাতে হয়েছে তাকে। দু'একজন কিনলেও বেশির ভাগ ক্রেতা পচা বলে তার মাছ ফিরিয়ে দিয়েছে। শেষপর্যন্ত অনেক কষ্টে মাছগুলো বিক্রি করতে পেরেছে সে। লাভ খুব বেশি হয়নি।

বাড়িতে ফিরতে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে গেছে। উঠানে পা দিয়েই দেখল শ্বশুর দাওয়ায় চাটাইয়ের ওপর কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। ভুবন তাড়াতাড়ি তার কপালে হাত দিয়ে দেখল—জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

ভুবনের ছোঁয়ায় হরিবন্ধু চোখ খুলে তাকালো। চোখগুলো টকটকে লাল। ঘোরের মধ্যে হরিবন্ধু বলল, 'অমা, তুই আইস্যো না? আঁত্তোন ভালা নো লাগের' বলেই সে আবার চোখ বুজলো।

পুকুর থেকে এক বালতি জল এনে পরম যত্নে শ্বশুরের মাথা ধুইয়ে দিল ভুবন। ভিজা গামছা দিয়ে চোখ-মুখ-হাত-সমস্ত শরীর মুছে দিল। মাথা মুছতে মুছতে বলল, 'বাআজি, তুই ইক্কিনি ধইজ্য ধরি থাকো। গঙ্গাপদ ইস্কুলত্তোন আইলে হিতারে তোঁয়ার ঢাগত বোয়াইদি রসমন ডাক্তারত্তোন ঔষধ আইন্‌তাম যাইয়্যম।'

ভুবন রান্না ঘরে ঢুকল। রান্না শেষ করে পুকুর থেকে স্নান করে এলো সে। শ্বশুর না না করলেও জোর করে ভাত খাওয়ালো তাকে। গঙ্গাপদ স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল। তাকে খাইয়ে নিজের খাওয়া শেষ করতে করতে সন্ধ্যে ছুঁই ছুঁই। গঙ্গাকে শ্বশুরের বিছানার পাশে বসতে বলে হিন্দুপাড়ার রসমোহন ডাক্তারের কাছে গেল ভুবন।

সে রাতেই মারা গেল হরিবন্ধু। রাতের ঘুম সকালে আর ভাঙলো না। আজান-ভোরে ঘুম ভাঙে তার। বিছানা ছাড়ার পর পুকুরঘাটে যায়। হাত-মুখ ধোয়, কাঠকয়লা দিয়ে দন্তহীন মাড়ি মাজে। তারপর 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' বলে উঠানের এপাশ থেকে ওপাশ পায়চারি করে। তারই কণ্ঠের সুর করা অস্পষ্ট আওয়াজে ভুবনেশ্বরীদের ঘুম ভাঙে।

সেদিন সকালে ভুবনেশ্বরীর ঘুম ভাঙতে বেশ দেরিই হয়ে গেল। চেয়ে দেখল—ছেলে তখনো অঘোরে ঘুমাচ্ছে। বিছানা ছেড়ে উঠানে এলো ভুবন, এদিক ওদিক তাকালো। কোথাও শ্বশুরকে দেখতে পেল না। ঘাটের দিকে একবার উঁকি দিল,সেখানেও নেই। বিছানায় শ্বশুর থাকবে এটা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি।

আমারবই.কম

জ্বরজারি হলেও এতক্ষণ ঘুমানো তার ধাতে নেই। তবুও ভুবন শ্বশুরের ঘরে উঁকি দিল, দেখল—হরিবন্ধু চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। মুখটা একটু হা-করা, চোখ দুটো নিমীলিত। ভুবন আরও একটু কাছে সরে এসেই বুঝতে পারল—শ্বশুর মারা গেছে। 'বাআজিরে' বলে একটা আর্তনাদ তার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো।

একান্ত প্রিয়জনের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভুবনের এই প্রথম। এর আগে সে স্বামীকে হারিয়েছে। কিন্তু সে মৃত্যু ছিল অপ্রত্যক্ষ। সে মৃত্যুর দৃশ্য তাকে অবসন্ন করেনি। শুধু মৃত্যুর জ্বালাটা তাকে বিষণ্ন ও বিপন্ন করেছে। শাশুড়ির মৃত্যুর সময় সে বাপের বাড়িতে ছিল। সে মৃত্যুও ছিল অনেকটা অপ্রত্যক্ষ। আজ মৃত্যুর মতো কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি সে। প্রথম ধাক্কাটা সামলে বুক ফেটে কান্না আসতে কয়েক মুহূর্ত লাগল ভুবনের। এই সময় একটা তীব্র অভাববোধ তার শরীর-মন আচ্ছন্ন করে ফেলল।

গঙ্গাপদ শোকের ভারে ন্যুব্জ হয়ে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। শোককে অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে।

খবর পেয়ে মাইজপাড়া থেকে ভাই জগৎহরি এলো। কাট্টলিতে উর্বশীকেও খবর দেয়া হল। গর্ভবতী বলে সে আসতে পারল না। তার স্বামী এলো। ভুবনের বাপ নৈদরবাঁশি অনেক আগেই মারা গেছে। বংশীর মা সারাটা সময় ভুবনের পাশে পাশে থাকলো, নিস্তব্ধ ভুবনকে দু'চারটা সান্ত্বনামূলক কথা বলার চেষ্টা করল। পাড়ার লোকেরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এলো। পুকুরপাড় থেকে বাঁশ কেটে মাচা তৈরি করল তারা। আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে তারা হরিবন্ধুর শব নিয়ে শ্মশানের দিকে রওয়ানা হল। পেছনে পেছনে নীরবে শ্লথ পা ফেলে এগুলো ভুবন। কানে ভেসে এলো, 'হরিবন্ধু স্বর্গবাসী অইয়ে, হরিবোল।'

আমারবই.কম

আট

দীনদয়ালের বয়স আটাশ না আটত্রিশ বোঝার উপায় নেই। গায়ের রঙ আলকাতরার মতো কালো। গাল দুটো ভেতর দিকে বসে গেছে। দৃষ্ট তাক্ষ—অন্তর্ভেদী যাকে বলে। মুখমণ্ডলে সর্বদা তেলতেলে একটা ভাব। চোখে শেয়াল-শেয়াল চাহনি। চুলগুলো কোঁকড়ানো, পেছন দিকে আঁচড়ানো। বিরল-শ্মশ্রু মুখমণ্ডলে লোভী একটা হায়েনা সর্বদা রতি-ক্রীড়ায় রত বলে মনে হয়। মাঝারি উচ্চতার দীনদয়ালের একহারা গড়ন। পরনে লুঙ্গি। হাফ-হাতা ফতুয়া গায়ে।

সভার মাঝখানে জোরহাতে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দীনদয়াল। চারদিকে উত্তর পতেঙ্গার গণ্য-অগণ্য জলদাসরা বসে আছে। দীনদয়াল বলছে, 'আঙ্গ বাড়ি সন্দ্বীপ, আঁর নাম দীনদয়াল। হছিম মুই দইরগা ভাঙি যাওনের হলে আঙ্গর মত আরো অনেকের ঘরবাড়ি ভাঙি গেছে গই। বেয়াগ্‌গিন হারাই আঁই আঁর ইস্ত্রি, মা-বাপেরে লই আন্নাগো গেরামে আইছি। আঙ্গরে আন্নারার হাড়াত থাইবারলাই

ইক্কিনি জাগা দেন। আঁই লেয়াপড়া জানি। আন্নাগো পোলাপাইনেরে আঁই পড়াশোনা শিখায়্যুম।'

'আঁরার পোয়াছা অল বঅর মুরখ। ঠিকমত ইস্কুলত পাডাইত নো পারি। দীনদয়াল যদি হিতারারে শিক্ষিত গড়নর ভার ল, তইলে ত খুব ভালা কথা। তোঁয়ারা কী কও?' সভাজনদের উদ্দেশে বিজন বহদ্দার বলল।

সবাই সমস্বরে বলল, 'ঠিক কথা, ঠিক কথা। হিবারে এই পাড়ার কোনো মিক্কে থাইক্‌তা দও। কাছে থাইলে পড়ালেয়া ভালা অইব।'

পাড়ার অধিকাংশ লোকের সমর্থনে ও সাহায্যে দীনদয়াল ভুবনদের পুকুরের পশ্চিমের খাসভূমিতে একটি কুড়েঘর তুলল। সেখানেই মা-বাপ ও স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস শুরু করল সে।

আমারবই.কম

সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলায় ছোট ছোট জেলেসন্তানদের পড়াতে শুরু করল দীনদয়াল। বিজন বহদ্দারের ছেলে কাজল, রামনারায়ণের ছেলে গুরুপদ, অন্নচরণের কন্যা হাঁইচনি, রামহরির ছেলে মতিলাল, লালমোহনের কন্যা উর্মিলা, বলরামের পুত্র হরিলাল—সবাই গুরুগৃহে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করলো। দীনদয়াল পরম যত্নে তাদেরকে রামসুন্দর রসাকের বাল্যশিক্ষা, ধারাপাত, ইংরেজি বর্ণমালা এ বি সি ডি পড়াতে লাগল। এতে উত্তর পতেঙ্গার জলদাসরা খুবই মুগ্ধ হল। তাদের সন্তানরা বিদ্যার দিগ্‌গজ হয়ে উঠবে—এটা ভেবেই তারা শিহরণ অনুভব করতে লাগল। জেলেনারীরা দীনদয়ালের কাছে আরও বেশি নুঁইয়ে পড়ল। মাছ দিয়ে, কলামূলাটা দিয়ে তারা প্রতিনিয়ত দীনদয়ালের নিকট তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যেতে লাগল। জেলেরা মাছমারায় নিতান্ত ব্যস্ত থাকে বলে নারীরাই তাদের সন্তানদের পড়াশোনার অগ্রগতি জানার জন্যে দীনদয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলল। দীনদয়াল তার দাওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের দুই সারি করে বসিয়ে কাউকে শ্লেটে লেখা শেখায়, কাউকে নামতা শেখায়। দুই একে দুই, দুই দুগুণে চার। আবার কারো পাশে গিয়ে গুনগুনিয়ে মুখস্থ করায়—

দুষ্ট মতি লঙ্কাপতি হরে নিল সীতাসতী।
রামচন্দ্র গুণাধার ত্বরা গিয়ে সিন্ধুপার ॥
ঘোরতর যুদ্ধ করে বধিলেন লঙ্কেশ্বরে।
সীতাসহ পুনরায় চলিলেন অযোধ্যায় ॥

সকালের পড়া শেষে সবাইকে পূর্বমুখী করে দাঁড় করায় দীনদয়াল। হাত জোড় করে উচ্চারণ করতে বলে—

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে।

তারপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'তোঙ্গ কাছে তোঙ্গর মা-বাপত্তোন বড় জিনিস আর নাই। মা-বাপ জন্ম ন দিলে তোঁয়ারা এই ভূমণ্ডলের সৌন্দর্য দেইখতে নো পাইত্তা। হেতাইনগোরে তোঁয়ারা পরম শ্রদ্ধা কইরবা। আর এক্খান কথা, মানুষের বড় সম্পত্তি অইল চরিত্র। যার চরিত্র নাই, তার কিছুই নাই। মনে রাইখ্যো অসৎ চরিত জগৎ ঘৃণিত।'

এইভাবে জলপুত্রদের মনে দীনদয়াল একটু একটু করে আলো ছড়াতে লাগল। আট-দশ বছরের বালক-বালিকারা দীনদয়ালের সকল কথার মাহাত্ম্য বোঝে না। তবে এটুকু বুঝতে পারে, এই মানুষটি অন্য দশজন মানুষ থেকে স্বতন্ত্র। সদা হাস্যময় এই মানুষটি যে অফুরন্ত স্নেহের আধার তা বুঝতেও তাদের বেগ পেতে হয় না। জলদাসপল্লীর সবাই বিশ্বাস করতে লাগল যে, দীনদয়াল নামক মানুষটি ঈশ্বর-প্রেরিত। তাদের সমাজে আলোকময় জীবনের সূচনা করার জন্যেই বুঝি ঈশ্বর দীনদয়ালকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন।

লোকটার নাম কি তা জলদাসরা জানে না, সবাই জনইপ্যার বাপ বলে ডাকে। আসলে জোনাব আলী তার অনেক ছেলের একটি। জোনাব আলীর বাপ জেলেদের মুখে অপভ্রংশ হয়ে জনইপ্যার বাপ হয়ে গেছে। সত্তরের কাছাকাছি তার বয়স, দীর্ঘদেহী দোহারা গড়ন। বিরাট মুখের থুতনিতে একগোছা সাদা দাড়ি। ডান চোখের নিচের কালো জটটি তার চেহারাকে বীভৎস করে তুলেছে। ডান হাতের বাহুতে কালো তাগিয়ায় মস্ত বড় একটা তাবিজ বাঁধা। সে-হাতের কনুইতে পেয়ারা সদৃশ একটি মাংসপিণ্ড। তাবিজটা সেটাতে আটকে যাওয়ার ফলে নিচের দিকে নামতে পারে না। হাতে লম্বা একটি মুলিবাঁশের লাঠি নিয়ে ঘোরে সে। তার বাড়িটি চরপাড়ায়। সরকার একদা তার জমির ওপর দিয়ে চলাচলের রাস্তা তৈরি করেছিল। সরকার যথানিয়মে দাম শোধ করে দিলেও জনইপ্যার বাপ দাবি করে এই রাস্তা তার। এই রাস্তাটিই সমুদ্রে যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম। জেলেরা এই পথ দিয়েই মৎস্যশিকারে যায়। পথের মানিকানার অজুহাতে সে জেলেদের কাছ থেকে বিনি পয়সায় মাছ নেয়। জেলেরা স্বেচ্ছায় মাছ না দিলে কেড়ে নেয়। জেলেদের জন্যে গালিটা সর্বদা তার ঠোঁটে তোলা থাকে।

কূলে নৌকা ভিড়লে জনইপ্যার বাপ নৌকার নিকটে যায়। যখন ইচ্ছে, যার নৌকা থেকে ইচ্ছে ভালমাছটি হাতে তুলে নিয়ে রওয়ানা দেয় বাড়ির দিকে। দাম চাইলে অজস্র অবিরাম গালিতে ভাসিয়ে দেয়। কখনো কখনো জেলেপাড়ায় এসে উপস্থিত হয় সে। উঠানের বাছাইকৃত মাছ নিয়ে টানাটানি করে।

আজ বংশীর মা গোলকবিহারীর কাছ থেকে মাছ কিনেছে। উঠানে বসে সেই কেনামাছ সে বাছাই করছিল স্বামী-সন্তান নিয়ে। কেনামাছের সঙ্গে একটা ইলিশমাছও ছিল।

বংশী বলল, 'মা, আজিয়া ইলিশমাছ হিবা নো বেইচ্যো। ইবা আঁরা খাইয়্যম। বউত দিন ইলিশমাছ নো খাই।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই সেখানে উপস্থিত হল জনইপ্যার বাপ। ইলিশমাছটি দেখে তার চোখ চকচক করে উঠল। এক ঝাপটায় মাছটি হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'অডি বংশীর মা, ইবা আঁই লই যাইর গই। দাম পরে লইচ।' বলেই সে রওয়ানা দেবার জন্যে পেছন ফিরল।

বংশীর মা বলল, 'ইলিশমাছ ইবা আজিয়া বেইচতাম নো। আঁর পোয়া খাইতো চাইয়ে। হিবা আঁরা খাইয়্যম।'

'কী কইলি অডি? আঁর খাওনোত্তোনো তোর পোয়ার খাওন বাইজ্যেদে না? পরে খাওয়াইচ।' বলে সে ঘাটার দিকে হাঁটা দিল।

'মাছ হিবা রাখি যাও। মাছ হিবা বেইচতাম নো।' সরোষে বলল বংশী।

'কী কইলি চোদানির পোয়া, আঁর জাগার উঅদ্দি মাছ ধরতি যাস্ ডোমর পোয়া, আর আঁরে মাছ নো দিবি?' লাঠি উঁচিয়ে জোনাব আলীর বাপ এগিয়ে এলো বংশীর দিকে।

ছেলেকে বাঁচানোর জন্যে বংশীর মা মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। তাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিয়ে বংশীর দিকে আরও দু'কদম এগিয়ে গেল সে। বংশীর বাপ এমনিতেই চুপচাপ নির্ভেজাল মানুষ। সেই মানুষটি হঠাৎ করে হুংকার দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাতে বসার পিঁড়িটি। রক্তাক্ত চোখে সে বলল, 'খানকির পোয়া, ডাকাইত্যাই গত্তি আইস্যচ দে না এডে। জোর গরি মাছ লই যাওর গই। আঁর বউয়েরে ধাক্কা মারি মাডিত ফেলাই দিয়স, পোয়ার গা উজু আইঅর। মগর মুল্লুক পাইয়চ দে না? এখনই বাইর অই যা, নইলে তোর ঠেমা আঁই গালি দিয়্যম।'

বংশীর বাপের এই যুদ্ধংদেহি ভঙ্গি দেখে জোনাব আলীর বাপ ভড়কে গেল। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই মাছটি হাত থেকে ছেড়ে দিল। তার উদ্ধত ভঙ্গি নিষ্প্রভ হয়ে গেল। সুড়সুড় করে সে ঘাটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে বলল, 'আইচ্ছা মাগির পোয়া, তোরা দুই চোদানির পোয়ারে আঁই চাই লইয়্যম। ওই মাগি কেএন গরি দইজ্যাত আঁর জাগার উঅদ্দি মাছ কিনতো যা, আঁই চাই লইয়্যম।'

জোনাব আলীর বাপ চলে গেল। কিন্তু বংশীদের উঠানে রেখে গেল এক বিভীষণ আতঙ্ক। যে-কোনো সময় এই জনইপ্যার বাপ তাদের মারধর করতে পারে। এই দরিদ্র দিন-এনে-দিন-খাওয়া মানুষগুলোর জীবন থেকে কিছুক্ষণ আগের আনন্দ তিরোহিত হয়ে গেল। এক গভীর বিষাদে তারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

বহুদিন পরে ভুবনেশ্বরী গঙ্গাপদকে নিয়ে বাপের বাড়ি এসেছে। একে নাইয়রও বলা যায়, আবার অশেষ অবসাদ থেকে মুক্তির প্রয়াসও বলা যায়। শ্বশুর তার

জীবনে বড় একটা আশ্রয় ছিল, অনেক বিপন্নতার সময় এই মানুষটির স্নেহছায়ায় নিবিড় স্বস্তি খুঁজে পেতো সে। এখন সব শেষ। স্বস্তিময় এই আশ্রয়টি হরিবন্ধু মরার সঙ্গে সঙ্গেই ভুবনের জীবন থেকে উবে গেল। এ সময় সে গঙ্গাকে আরও নিবিড়ভাবে বুকে টেনে নিল।

অষ্টম শ্রেণী পাস করে সবে নবম শ্রেণীতে উঠেছে গঙ্গা। হাইস্কুলটি প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত। পড়ায় এখন তেমন মন নেই গঙ্গার। মায়ের কষ্ট তাকে অবসন্ন করে। পড়াটা ছেড়ে দেবে বলেই মনে মনে ঠিক করে সে। ঠিক এই সময় মারা যায় দাদু হরিবন্ধু। ফলে পড়ালেখা ছেড়ে দেবার ইচ্ছে ও যুক্তি আরও প্রবল হয়।

বেশ কয়েকদিন থাকবে বলেই বাপের বাড়ি মাইজপাড়ায় এসেছে ভুবন। বাস্তবতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে একটা সময়ে সে নিজের ভেতর খুবই ক্লান্তি বোধ করতে শুরু করে। সে-রকম একটা অসহায় মানসিক অবস্থায় ভাই জগৎহরি এসে বলল, 'দিদি, চল যাই কদিন। বাপের বাড়িত গেলে তোঁয়াত্তোন ভালা লাইবো। তোঁয়ার ভাই-বউও আরে বার বার পরি কইয়ে তোঁয়ারে লগে লই যাইবাল্যাই।'

ভুবন না করেনি। ঘরে তালা লাগিয়ে ছেলেকে নিয়ে জগৎহরির পিছু নিয়েছে। আসবার সময় প্রতিবেশী অনন্তবালাকে বলে এসেছে, 'অ জগদীশ্যার মা, আঁরঅ ঘরবাড়িগিন ইক্কিনি চাইঅ। মনর জ্বালা জুড়াইবাল্যাই বাপর বাড়িত যাইর।'

ভুবনদের ঘরবাড়ি, উঠান, উঠানের পাশে খালি জায়গাটি–সব খা খা করছে। এ বাড়িতে এখন কোনো মানুষজন নেই। পরপর তিনটি মৃত্যু এ বাড়ির সকল কোলাহল, সকল আনন্দ-আবেগ কেড়ে নিয়েছে। চারদিকে নীরব, নির্জন। এরকম একটা নির্জনতার অপেক্ষায় ছিল গোলকবিহারী। এ বছর সে নতুন বহদ্দার হয়েছে। মা-গঙ্গাও তার দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। প্রচুর মাছ ধরা পড়ছে তার জালে। তার আয় আশাতীত। টাকা মানুষের ভেতরের কূটবুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলে।

স্ত্রী, ছেলে, ছেলেবউ, নাতি-নাতনি নিয়ে সংকীর্ণ জায়গায় বসবাস করছিল গোলকবিহারী। ছোট্ট ভিটিতে তার পরিবার-পরিজন-গাউর ইত্যাদির সংকুলান হচ্ছিল না। এখন তার একটা খোলামেলা ভিটে দরকার। হঠাৎ করেই গোলকবিহারীর বুদ্ধি খুলে গেল। আরে, সে তো হরিবন্ধুর ভাই। হোক না দূর-সম্পর্কের। তারপরও তো ভাই। এই সম্পর্কের সুবাদে সেও তো হরিবন্ধুর জায়গার ভাগিদার। হরিবন্ধুর উঠানের পাশে একটা খালি জায়গা পড়ে আছে। সেখানে তো সে ঘর তুলতে পারে। সে অধিকার তো তার আছে। সে-রাতেই সে তিন ছেলেকে নিয়ে সলাপরামর্শ করল। বিষয়টি স্বার্থসংশ্লিষ্ট বলে ছেলেরাও সমর্থন জানালো গোলককে।

দিন দুয়েকের মধ্যে গোলক ও তার তিনপুত্র তিন-চারজন ঘরামির সহযোগিতায় ভুবনদের সেই খালি জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় চার-কামরার একটা চৌচালা ঘর তুলে ফেললো। পাড়া প্রতিবেশীর জিজ্ঞাসাকে এড়িয়ে কতকটা রাতের আঁধারেই সে এই ঘরে পরিবার-পরিজন নিয়ে উঠে এল।

এই খবর ভুবনের কাছে পৌছাতে পৌছাতে দিন চারেক লেগে গেল। ভুবন, জগৎহরি, গঙ্গাপদ এসে দেখল উঠানের পার্শ্ববর্তী খালি জায়গাটিতে শণের ছাওয়া একটা চৌচালা ঘর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বাচ্চাকাচ্চারা উঠানময় কিলবিল করছে।

ভুবনের মাথায় বজ্রাঘাত নেমে এল। এখন সে কী করবে? এই মুহূর্তে তাকে কে সৎপরামর্শ দেবে? কার কাছে যাবে সে? তার বিমর্ষভাব দেখে জগৎহরি বলল, 'দিদি, তুঁই এই রইম্যা ভাঙ্গি নো পইড্যো। ভগমান আছে। ঈশ্বর আঁরারে এই বিপদত্তোন উদ্ধার গরিবো।'

ভাইয়ের কথায় ভুবনের মধ্যে স্থিরতা এলো। একটা দৃঢ়তা তার ভেতর আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে লাগল।

বিকেলের দিকে ভুবন বংশীর মায়ের কাছে গেল। বংশীর মা বলল, 'চল, সর্দার অলর কাছে যাই। হিতারারে তুঁই তোঁয়ার দুঃখর কথা বুঝাও। এত বড় অবিচার ভগমানে সহ্য গইত্যো নো। চল, পইল্যা বিজন বহদ্দারের কাছে যাই।'

বংশীর মা ভুবনকে নিয়ে বিজন বহদ্দারের বাড়িতে গেল। বহদ্দারের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাকে ভুবনের দুঃখের কথা ইনিয়েবিনিয়ে বলল বংশীর মা। বিজনের স্ত্রী বহদ্দারের কাছে গিয়ে বলল, 'গঙ্গার মা তোঁয়ার লগে কথা কইতো চাআর।'

ভুবন ও বংশীর মা বিজনবিহারীর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে বসল। তাদের মুখমণ্ডলের অনেকটা ঘোমটায় ঢাকা। ভুবন অত্যন্ত আকুতিপূর্ণ স্বরে বলল, 'ধনবাইশ্যার বাপ আঁরঅ খালি ভিঁডাগিন দখল গরি ঘর বাঁধি ফেইল্যে। এই জাগা ইনর মালিক আঁর হউর। আজিয়া আঁই অসহায়। তুঁই আঁরে এই বিপদত্ সাহায্য গর বহদ্দার।'

ভুবনের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল বংশীর মা। গোলকবিহারীর এই জবর দখল অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। ঈশ্বর এই অন্যায়ের ভার সইবে না। এর একটা বিহিত করে না দিলে এই স্বামীহীন মেয়েটি অন্যায়ের প্রবল স্রোতে ভেসে যাবে। এই সকল কথা জলার্দ্র কণ্ঠে বলে গেল বংশীর মা।

সব শুনে বিজন বলল, 'তুঁই চন্দ্রমণির বউয়েরে কও সালিশ ডাইবারলাই। এখন জো। বেয়াগুনে মাছ-জাল লই বেত্ত। আইয়েদ্দে বিষুদ-গুক্কুর বারে ডালা পড়ি আইবো। হেই সমত সালিশ ডাইক্তো কও। চাই কী গরন যায়। অ, আর এক্খান কথা, আঁরার সমাজত তো আরও চাইরজন সর্দার আছে। হিতারারে কথাগিন আগে বুঝাই রাখ।'

শুক্রবার সন্ধ্যায় ভুবনের উঠানে সালিশ বসেছে। যুবরাজ বিকেলবেলায় প্রতি ঘরে গিয়ে বলে এসেছে এই সালিশের কথা। যুবরাজ জলদাসপাড়ার ডাউক্যা। কখনও কোনো সালিশের প্রয়োজন হলে সে-ই জলপুত্রদের ডেকে একত্র করে। এজন্যে বাদি-পরিবার তাকে তিন টাকা দেয়। আজও মানুষ একত্র করার দায়িত্ব পালন করেছে সে। গতদিন গোলকবিহারীকে বলে রেখেছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা। সে যাতে সালিশে উপস্থিত থাকে তাও বলেছে। গোলককে এই কথাগুলো বলতে যে সর্দাররাই বলেছে—সেটা বলতেও ভোলেনি সে।

উঠানে বিছানো পাটির ওপর গোলাকার হয়ে বসেছে জেলেরা। সর্দার ও বহদ্দাররা সামনের সারিতে, মধ্যমশ্রেণীর জেলেরা বসেছে তাদের কাছ ঘেঁষে। কিন্তু নিঃস্ব দরিদ্র জলপুত্ররা তাদের কাছ থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে অনেকটা সংকুচিত হয়ে পাটির কোনায় বসেছে। মাঝখানে পানের বাটা, তাতে পানের সঙ্গে চুন-সুপারি ও খয়ের। দুটো সস্তাদামের বিড়ির বান্ডেলও পাটির ওপর দেখা যাচ্ছে। তার পাশেই অলসভাবে পড়ে আছে একটা ম্যাচের বাক্স। এগুলোর যোগানদার ভুবনেশ্বরী। সালিশের সময় সালিশকারদের খাওয়ার জন্যে কাদিকে এগুলো দিতে হয়।

সভার চতুর্দিকে নানা বয়সের তরুণ ও অতি সাধারণ জেলেরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখে মুখে গভীর কৌতূহল। সভার একটু বাইরে একটা পিঁড়িতে জড়সড় হয়ে বসে আছে ভুবন। তার পাশে গুড়াবি, বংশীর মা, রামকালির মা, অনন্তবালা প্রভৃতিরা বসেছে। একটু দূরে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উদ্বেগাকুল চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গা।

সর্দারদের ঠিক উল্টো দিকে গোলকবিহারী বসেছে তার তিনপুত্রকে নিয়ে। মুখটা তার বেশ কঠিন। সেই কাঠিন্যের ফাঁকে দুশ্চিন্তাটাও উঁকি দিচ্ছে। ঠিক তার পাশেই বসেছে তার পাউন্যা নাইয়া রামহরি। কী একটা নিবিড় মনোবেদনায় সে নিমগ্ন। সে অনেকটা বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

সভার মাঝখান থেকে রামনারায়ণ বহদ্দার বলে উঠল, 'কই, গঙ্গাপদর মা কডে, কিঅল্যাই সালিশ ডাইক্যো সভার মইধ্যান্‌দি আইয়েরে কও।'

এই কথায় ভুবন অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে সভার কাছাকাছি এগিয়ে এলো, উপস্থিত মানুষগুলো তাকে পথ করে দিল সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। ভুবন সভার অভ্যন্তরে সামান্য এগিয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করে বলতে শুরু করল, 'বাআজি অল, আঁই অসহায় উগ্‌গা মাইয়াপোয়া। তোঁয়ারা জান স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ি বিয়াগ্‌গুনরে হারাই আঁই আজিয়া মাথাত মাছর খাড়াং লই পথে পথে ঘুরির। পোয়াউয়ারে মানুষ গরিবাল্যাই আঁই কষ্টরে কষ্ট মনে নো গরির। জীবনর বিয়াগ্‌ কিছু তেয়াগ গরিয়েরে আজিয়া আঁই ...'

'তোঁয়ার কষ্টর কথা আঁরা বিয়াগ্‌গুনে জানি, তুঁই আজিয়া কিঅল্যাই সালিশ ডাইক্যো হিয়ান কও।' মমতা মাখানো সুরে কামিনী সর্দার বলল।

'ধনবাইশ্যার বাপ আঁরঅ জাগার উঅর ঘর বাইন্ধ্যে। কঅদ্যে হিয়ান বলে হিতারো জাগা। আঁরঅ জাগাগিন ফিরি পাইবারলাই তোঁয়ারার কাছে বিচার চাইর'—নিজের আবেগ অনেক কষ্টে সংবরণ করে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল ভুবন।

তার কথা শেষ হতে না হতেই সভায় মিশ্র গুঞ্জন উঠল।

মনোরঞ্জন সর্দার বলল, 'ধনবাইশ্যার বাপ তোঁয়ার কিছু কওনর আছে না?'

'আছে। এই জাগা ইনর দাবিদার আঁই। আঁই হরিবন্ধু বদ্দার ভাই, হেতল্যাই এই জাগার অংশ আঁইঅ পাই'—দৃঢ়কণ্ঠে বলল গোলকবিহারী।

'কী রইম্যা ভাই?' পেছন থেকে আওয়াজ আসল।

'এই চন্দ্রমণির বাপর পিসির ননদর পোয়া লাগি আঁই। হেই হিসাবে চন্দ্রমণির বাপ হরিবন্ধুর ভাই অই আঁই।' বলল গোলক।

সভায় হৈ-হে আওয়াজ উঠল।

'চালবাজি গরিবার আর জাগা নো পান্দে, অসহায় মহিলার জাগা দঅল গইজ্যে দে। লেডা পাইয়েরে হিতারার অজান্তে ঘর তুইল্যে। চাই, আঁরার জাগাত তুইলতো কওতো।' ইত্যাকার নানা কথা সভায় উচ্চারিত হতে লাগল।

সর্দারদের মধ্যে নিম্নস্বরে নানা সলাপরামর্শ হল। বেশ কিছুক্ষণ পরে উপরের দিকে ডান হাত তুলে গুঞ্জন থামিয়ে রামনারায়ণ বহদ্দার বলল, 'আঁরা বিয়াগুনে পরামর্শ গরি চাইলাম দে, এই জাগার মালিক গোলকবিহারী নো। দূরসম্পর্কের ভাইঅর দোয়াই দি এই জাগা তাঁই দখল গরিত নো পারে। ধনবাইশ্যার বাপ তোঁয়ারে ছ'মাস সময় দিয়া গেল। ছ' মাসর মইধ্যে তুঁই জাগা খালি গরি দিবা। এই ভিডাত্তোন যাইবা গই।'

'যদি নো যাই'—এতক্ষণ চুপচাপ থাকা ধনবাশি উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল।

বিজনবিহারী রাগতস্বরে বলল, 'তইলে তোরারে একঘইজ্যা গরি রাইখ্যাম. আগুন পানি বন্ধ গরি দিয়্যাম। বেবসা টেবসা বেয়াগ্গিন লাডত উডিবো গই।'

জেলেসমাজে একঘরে হয়ে বসবাস করার মতো মর্মান্তিক ব্যাপার আর নেই। একঘরে-লোকদের সঙ্গে কেউ কোনো সম্পর্ক রাখে না। সকল সামাজিক নিমন্ত্রণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। একঘরে-পরিবারটি আবার সহজে সমাজভুক্ত হতে পারে না। পুনরায় সমাজভুক্ত হওয়া অনেক সাধ্য-সাধনার ব্যাপার। 'একঘইজ্যা গরি রাইখ্যাম'—বিজনবিহারীর এই ঘোষণায় গোলকের পরিবারটি ভয় পেয়ে গেল।

গোলকবিহারী ভাবল, প্রকৃতপক্ষে এ জায়গার মালিক তো সে নয়। গোলকবিহারী বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আঁরা ছ'মাসর মইধ্যে জাগা ছাড়ি দিয়্যাম।'

'তইলে সালিশ ইয়ান্দি শেষ'—বলল পূর্ণ বহদ্দার।

'না, আঁর এক্খান কথা আছে।' প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চস্বরে কথাগুলো বলল গোলকবিহারীর পাউন্যা নাইয়া রামহরি। 'আঁর মাইয়া গর্ভ।' বিষাদময় একটা দূরাগত কণ্ঠ ভেসে এলো সভায়।

সভার একপাশে চুপচাপ বসে ছিল বৃদ্ধ যোগেশ। রামহরির কথাটা কানে যেতেই ধীরে ধীরে বলল, 'কি কইলি? তোর মাইয়ার পেট বাইজ্যে? তোর মাইয়ার তো আইজো বিয়া নো অ। এই কাম ক'নে গইজ্যে? ভগমান, কি ঘোর কলিযুগ আই গেল গই।'

'ধনবাইশ্যার বাপর গাউর হারাধইন্যা আঁর মাইয়ারে নষ্ট গইজ্যে'—রামহরির এই কথায় কোলাহলময় সভায় গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

রামহরির চার ছেলে এক মেয়ে। দু'ছেলে কর্মক্ষম, মাছধরার কাজে রামহরিকে সহযোগিতা করে। অন্য দুজন এখনো নাবালক। মেয়ে তীর্থবালার বয়স পনেরো ছুঁই ছুঁই। কিন্তু বয়সের তুলনায় তার শরীরের গড়ন বড় বাড়ন্ত। মনটা তার হরদম চুলোবুলো করে। একধরনের খাই-খাই ভাব তার শরীরে, চলনে, বলনে। রামহরির স্ত্রী রাজবালা একটু আলাভোলা ধরনের। মেয়ের চলাফেরার ব্যাপারে সে একেবারেই উদাসীন। হারাধন এ বছরেই প্রথম সন্দ্বীপ থেকে গাউর হিসেবে এসেছে গোলকবিহারীদের বাড়িতে। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। চিকন-চাকন গড়ন তার। শরীরটা তামাটে হলেও দেখার মত। বহদ্দারের গাউর বলে পাউন্যা নাইয়ার বাড়িতে তার অবাধ যাতায়াত। এই সুযোগে তীর্থবালা ও হারাধনের কাছাকাছি আসা এবং এই নিদারুণ পরিণতি।

হারাধন ও তীর্থবালাকে সভায় ডাকানো হল।

উভয়ের সাক্ষ্যে ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হল।

সর্দাররা রায় দিল, তীর্থবালার সঙ্গে হারাধনের বিয়ে দিতে হবে। এছাড়া, আর কোনো উপায় নেই।

সবার পেছন থেকে তীর্থর মা রাজবালা চিৎকার করে উঠল। বলল, 'ইয়ানো আঁরার কোয়ালত আছিল। ভাদাইম্যার লগে আঁর মাইয়ার বিয়া দওন পড়িবো। কডে মা, কডে বাপ। বজ্জাতিনির হেঁডাত যেএন চুলকাইয়ে হেএন বিষ মরুক।'

ঠিক হল—আগামী মাসে দিনক্ষণ দেখে হারাধনের সঙ্গে তীর্থবালার বিয়ে হবে। বিয়ের খরচ বহন করবে রামহরি। বিয়ের পর এই পাড়াতেই হারাধনকে থেকে যেতে হবে। কোনো খালি ভিটেয় একটা ঘর তুলে তীর্থবালাকে নিয়ে সংসার পাতবে সে। হারাধন এতে খুশি। কারণ তার পিছুটান নেই। বহুদিন আগে তার বাপ-মা মারা গেছে। সন্দ্বীপের আবাসস্থলটি ভাঙনের মুখে।

নয়

দীনদয়ালের পরিবারটি অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা থেকে এখন অনেকটা মুক্ত। বাপ সমুদ্রে হুরিজাল বায়, টাউঙ্গাজাল নিয়েও বের হয় কোনো কোনো রাতে। মা মাছ বেচে হাটে, ভদ্রপল্লীতে।

জেলেসন্তানদের পড়ানো বাবদ কিছু টাকা আয় হয় দীনদয়ালের। তিনজনের আয়ে তার পরিবারে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। দীনদয়াল এর মধ্যে বুঝে গেছে, এ জলদাসপাড়ায় তার অবস্থান পোক্ত হয়ে গেছে। সর্দাররা তাকে মর্যাদা দেয়, সাধারণ জেলেরা পথেঘাটে নমস্কার জানায়। মাঝেমধ্যে দীনদয়াল নিজের দিকে তাকায়। ভাবে—কোথাকার দীনদয়াইল্যা আজকে কত উঁচু মর্যাদায় এসে দাঁড়িয়েছে। অভাবে-সংকীর্ণতায়-দারিদ্র্যে-জীর্ণতায় একদা তার জীবন অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। যেদিন সমুদ্র তাদের বসতভিটেটি গ্রাস করে নিল, সেদিন তার মাথায় বজ্রাঘাত নেমে এসেছিল। আর আজ তার চারদিকে সমীহের বাতাবরণ, শ্রদ্ধার আবেশ।

মনে যে তার কিঞ্চিৎ কষ্ট নেই তা নয়। বউটি তার বাঁঝা। বছর চারেক আগে চরণদাসী নামের এই মেয়েটিকে বাপ-মা পুত্রবধূ হিসেবে নির্বাচন করেছিল। চরণদাসীর বাপের বাড়ি সন্দ্বীপের চরভাটায়। একহারা গড়ন ছিল তার। কিন্তু চার বছরের মাথায় বিরাট মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে সে। চরণদাসীর গায়ের রঙ কালো, চোখ দুটি বড় বড়। বিপুল স্তনভারে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটে। হাঁটার সময় বিরাট আকারের পাছাতে বঙ্গোপসাগরের ঢেউ ওঠে। গোটাটা সময় সংসারের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে সে। এমনিতে কথা বলে কম। রাগলে হিংস্র হয়ে ওঠে। মুখে যা আসে, তা-ই চিৎকার করে বলে। কণ্ঠ তার ভাঙা ভাঙা, বদরাগী বউটি দীনদয়ালের দিকে তেড়ে আসে কখনো কখনো। বউয়ের স্থূল গড়ন, তার অভব্য পাশবিক আচরণ দীনদয়ালের মনকে বিষিয়ে তোলে মাঝে মাঝে।

অভিভাবকরা বিশেষ করে জেলেনারীরা দীনদয়ালের কাছে আসে তাদের প্রতিপাল্যদের পড়াশোনার অগ্রগতির খোঁজখবর নিতে। ভাই হরিলালের পড়ার সুলুকসন্ধান করতে আসে মঙ্গলী। বলরামের মেয়ে সে। পনেরো ষোল বছর বয়স। বাপ সংসারের অন্নসংস্থানে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও সংসারের হালটা ঠিকমতো কব্জা করতে পারছে না বলরাম। টাকার অভাবে এত বয়স হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মঙ্গলীকে বিয়ে দিতে পারেনি সে। তিন ছেলে, তিন মেয়ে, স্ত্রী ও বুড়ো মা নিয়ে সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। অনেকটা মঙ্গলীর প্রণোদনায় বলরাম ছোটছেলে হরিলালকে দীনদয়ালের পাঠশালায় পাঠিয়েছে। কর্মব্যস্ততার জন্যে ছেলের পড়ালেখার কোনো খোঁজখবর নিতে পারে না বলরাম। সে দায়িত্ব পালন করে মঙ্গলী। এ জন্যে দীনদয়ালের বাড়িতে সময়ে অসময়ে ঘনঘন যাতায়াত তার। পড়ানো শেষ হওয়ার অনেক আগে যায় সে, দীনদয়ালের দাওয়ায় বসে থাকে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পড়ুয়াদের দিকে, দীনদয়ালের দিকে।

পড়াশেষে গুড়াগুর্বাদের ছুটি দিয়ে দেয় দীনদয়াল। একটু মাথাউঁচু শক্ত সমর্থদের নিয়ে পাড়ায় বের হয়। চারটি পাড়া নিয়ে উত্তর পতেঙ্গার জেলেপল্লীটি

গঠিত। উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, পূর্বপাড়া ও পশ্চিমপাড়া। ছাত্রদের নিয়ে দীনদয়াল এসব পাড়ায় যায়। বাড়ির চারপাশে, পথের কিনারায়, উঠানের কোনে পড়ে-থাকা আবর্জনা নিজে পরিষ্কার করে, ছাত্রদের দিয়ে পরিষ্কার করায়। পরিষ্কার করতে করতে বলে, 'স্বাইস্থ্তুন দামি জিনিস আর নাই। আর স্বাইস্থ ঠিক রাখে পরিবেশ। পরিবেশ অর্থ বুঝেননি আন্নারা? পরিবেশ হইল গিয়ে যেন মাছের হঁচাগন্ধা অংশ,ঘর-গেরস্থালির নানা উচ্ছিষ্ট জিনিস যেখানে সেখানে না ফেলা। আন্নারা উডানর এককোনায় এউগ্গা গত্ত কইরবেন, হিয়ানে ময়লা আবর্জনা হেইলবেন। তাইলেই স্বাইস্থ ঠিক থাইক্‌বো, অসুখ বালাই অইতো নো।'

মাছমারারা তার সব কথা বুঝে উঠতে পারে না। তবে এইটুকু বোঝে যে, তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত।

আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র—এই তিন মাস জলপুত্রেরা সমুদ্রে দুই ধরনের জাল পাতে। বিহিন্দিজাল আর টংজাল। ডালায় অর্থাৎ পঞ্চমী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত সমুদ্রে তারা বিহিন্দিজাল বসায়। এসময় স্রোতে টান থাকে কম। লহট্যা, তপসে, ইচা, পাঙ্গাস, ঘোড়া, সুন্দরী ইত্যাদি মৃদু স্রোতের মাছ এগুলোই জালে ধরা পড়ে তখন। একাদশী থেকে স্রোতের গতি বাড়তে থাকে। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় তা প্রবলতম হয়। এই সময়টাকে জেলেরা বলে জো। জো'তে বিহিন্দিজাল বসানো যায় না। এগুলো আকারে অনেক বড়। তাই স্রোতের টানে ফেঁসে যায়। জেলেরা এইসময় চিকন নাইলন সুতার হালকা ছোট আকারের টংজাল বসায়। জেলেরা বছরের এই সময়টার জন্যেই অপেক্ষা করে থাকে। প্রচুর ইলিশ টংজালে ধরা পড়ে তখন। ইলিশ জেলেজীবনে প্রাচুর্য আনে। বহদ্দাররা মাছ বিক্রি করে খুশি হয়। বিয়ারিরা কিনে সুখি হয়। অলিগলির ক্রেতারা ইলিশের ঝোলঝালে রসনা তৃপ্ত করে।

আজ কামিনী ও গোলকবিহারীর জালে নৌকাভর্তি ইলিশমাছ ধরা পড়েছে। বিজনের নৌকাতেও প্রচুর মাছ আজ। বাতাসের তোড়ে আর ঢেউয়ের আঘাতে পূর্ণচন্দ্রের নৌকা ডুবেছে। জাল থেকে মাছ তুলতে পারেনি পূর্ণর ছেলেরা। মরতে মরতে বেঁচে গেছে। রামনারায়ণের নৌকা এগিয়ে না এলে মরতেই হতো আজ তাদেরকে। নকুল বহদ্দারের নৌকা ঝড়ের ঝাপটায় ভেসে গেছে বহু উত্তরের সীতাকুণ্ডের দিকে। কখন ফিরে আসে ঠিক নেই। সমুদ্রকূলে মাছ বিক্রিতে আজ তেমন ঝামেলা হয়নি। শুক্কুর দাদনদার বিপুল পরিমাণ মাছ দেখে কামিনীর সঙ্গে কোনো ঝামেলা করেনি। বাজারদরেই মাছ কিনেছে। গোলকবিহারী দাদন নেয়নি বলে নিজের দামে বিয়ারিদের কাছে মাছ বেচেছে। ফলে কামিনীর চেয়ে অনেক বেশি টাকা আজ তার কোঁচড়ে এসেছে।

বিজন বহদ্দারের মন এখন ফুরফুরে। এ বছর তার আয়-ইনকাম বেশি। মাছের মরসুম শেষ হতে এখনো মাস দুই বাকি। এর মধ্যেই আশাতীত টাকা তার

হাতে এসে গেছে। বউটি ষষ্ঠ সন্তান প্রসব করেছে। ছেলে। জেলেপরিবারে ছেলে বড় সম্পদ, ভবিষ্যৎ আয়ের উৎস। খালাস হবার পর বউয়ের শরীরটার চেকনাই। গায়ে একটু বাড়তি চর্বি লেগেছে। বউয়ের টসটসে চেহারা দেখে দেখে বিজনের তলপেট শিরশির করে। বিজন মনে মনে ঠিক করে বউটিকে সোনার একটা কিছু গড়িয়ে দেবে।

বিকেলে স্যাকরার দোকানে গিয়ে দুটো নোলক গড়তে দিল সে। রসিকরঞ্জন স্যাকরা ঠাট্টাচ্ছলে বলল, 'কি বহদ্দার, বউ তো তোমার একটা, নাকও বোধহয় একটা। দুটো নোলক কার জন্যে? অ্যা? '

বিজন একটু উত্তপ্তস্বরে বলল, 'তাতে তোঁয়ার কি? তোঁয়ারে বানাইতাম দি বানাইবা, নো পাইল্যে কও? অন্য বাইন্যার কাছে যাই। উগ্‌গা আর দুউয়া!'

'আহা! রাগ করছো কেন বহদ্দার। একটু মশকরা করলাম আর কি। তোমরা যত বেশি গয়না বানাবে, ততো বেশি আমাদের লাভ। শিক্ষিত লোকরা খাদ-মাদ নিয়ে বড্ড বেশি প্রশ্ন তোলে। তোমরা সে রকম না। তোমরা বেশ ভাল।' নরম সুরে কথাগুলো বলল রসিক।

আমারবই.কম

'এ্যাতো প্যাঁচাইন্যা কথা নো বুঝি, কঁঅত্তে দিবা কও?' বিজনের কণ্ঠ থেকে রাগের ঝাঁঝ তখনো যায়নি।

আমারবই.কম

রসিক বলল, 'পরাও নিও।'

দিন তিনেক পরে বিজন তার বউয়ের হাতে একটি নোলক তুলে দেয়। বউটি অল্পসময়ের মধ্যে নোলকটি পরে, কপালে একটু সিঁদুরের টিপ দিয়ে মুখে মোটা করে পাউডার বুলিয়ে বিজনের সামনে এসে দাঁড়ায়। বিজন সিক্ত হতে থাকে।

সপ্তাহখানেক পরে অন্য নোলকটি গোপালের বউ বকুলির নাকে দোল খেতে লাগল।

আমারবই.কম

মাছ কিনে বাছাই করে বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা দিতে দিতে বেশ দেরিই হয়ে গেল তাদের। পুরুষদের প্রায় সবাই সমুদ্রঘাট ছেড়ে চলে গেছে। শুধু রয়ে গেছে বংশীর মা, গঙ্গার মা, গুড়াবি ও মালতির মা। সমুদ্রের জলে বহদ্দারদের কাছ থেকে কেনামাছ ধুয়ে পরিষ্কার করে খাড়াং-এ ভরে মাথায় নিয়ে চারজনেই একসঙ্গে রওয়ানা দিল। সমুদ্রতীর ছেড়ে মেঠো পথ দিয়ে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। দেরি হয়ে গেছে, আরও দেরি হলে বাজারে ক্রেতা পাওয়া যাবে না।

টুপটাপ করে মাছের পানি গায়ে পড়ছে। এই আঁশটে গন্ধময় জলকে উপেক্ষা করে চারজনেই দ্রুতবেগে পাশাপাশি হেঁটে পথ ফুরাচ্ছিল। জোনাব আলীর বাপের বাড়ি অতিক্রম করার পর পেছন থেকে আওয়াজ এলো, 'অই জাইল্যানিঅল খাড়া।'

এই ডাক কার—আর কেউ বুঝতে না পারলেও বংশীর মা বুঝতে পারল। সে বলল, 'নো থিয়াইয়ো। জোরে হাঁডো।'

ওরা হাঁটা থামালো না।

'ওই ডু-নি হারামজাদি। খাড়াইতাম কইদ্যে নো ফুনঅর' বলতে বলতে লাঠি হাতে বংশীর মায়ের সামনে এসে দাঁড়ালো জোনাব আলীর বাপ। 'ঐদিন মাছ চাইলাম দে তুরতুরালি, আজিয়া এই লাংঅর জাগার উঅদ্দি হাঁডি যাওন পড়িবো, হিয়ান মনত নো আছিল?'

বংশীর মা বলল, 'তুঁই বুড়া মানুষ, মুখ খারাপ নো কইজ্যো?'

'ধুত্তোর মুখ খারাপর মারে চুদি, মুখ খারাপ মারাঅদ্যে না, খানকি' বলতে বলতে এক ঝটকায় বংশীর মায়ের মাথা থেকে মাছের খাড়াংটা মাটিতে ফেলে দিল জোনাব আলীর বাপ। মাছগুলো এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ল।

বংশীর মা অসহায় দৃষ্টিতে জনইপ্যার বাপের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তোর বাপদাদারে লের দিতাম। মাইয়াপোয়ার গাআত হাত' বলতে বলতে এতদিনের নিরীহ ভুবন পেছন থেকে জোনাব আলীর বাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার দেখাদেখি অন্য তিন জেলেনিও নিষ্ক্রিয় থাকল না। খামচি, নখের আঁচড়, থাপ্পড় দিতে দিতে জোনাব আলীর বাপকে মাটিতে শুইয়ে দিল। গায়ের গেঞ্জি ছিঁড়ে একাকার। লুঙ্গিটা দুই হাতে ধরে অব্রু রক্ষা করছে জোনাব আলীর বাপ। আর চিৎকার করে বলছে, ' আঁরে বাঁচারে। ডু-নি অলে আঁরে মারি ফেলাইলোরে। কন কন্তে আছস্, আঁরে ইতারার হাতত্তুন বাঁচারে।'

তার চিৎকার শুনে আশপাশের খেত থেকে কিছু মুসলমান চাষি উঠে এল। দু'চার জন জেলেও উপস্থিত হল সেখানে। সকল কথা শুনে মুসলমান চাষিরা বলল, 'তুঁই ইয়ান অন্যায় গইজ্যো জনইপ্যার বাপ। আইল্যা হোক, হাইল্যা হোক, মাইয়াপোয়া তো। মাইয়াপোয়ার গাআত হাত তোলন গুনাহ্। আর রাস্তা ইবা সরকারর। তোঁয়ার নো।'

জোনাব আলীর বাপ একেবারে নির্বাক। নিস্তেজ। জেলেনির হাতে মার খেয়ে তার এতদিনের মান-সম্মান সবই গেছে। [illegible] মাটি থেকে লাঠিটা কুড়িয়ে নিল সে। কিছু একটা করার চণ্ড ইচ্ছে ভিতরে সক্রিয় হয়ে উঠলেও প্রতিপক্ষ প্রবল বলে মাথা নিচু করে ধীর পায়ে সে নিজের বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল।

অল্পসময়ের মধ্যে কথাটা গোটা জেলেপাড়ায় প্রচার হয়ে গেল। সমস্তজীবন মারখাওয়া জেলেসমাজের চারজন নারী আজ জেলেদের দীর্ঘদিনের অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে। শক্ত সমর্থ অর্থবান জেলেরা যা এতদিন করতে পারেনি, আজ চারজন নিঃস্ব হতদরিদ্র জেলেনারী তা করেছে। বেশি প্রচার হল ভুবনেশ্বরীর কথা। এই মারের নেতৃত্ব দিয়েছে ভুবনেশ্বরী। প্রায় গোটাটা জীবন যে শুধুই মার খেয়ে গেছে নিয়তির হাতে, সে নারীটিই আজ জেগে উঠেছে। সে-ই প্রথম মারটা শুরু করেছে। এই ঘটনাটি নানা ডালপালা সহকারে জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে বর্ণিত

হতে থাকল। একধরনের চাপা উল্লাস সমস্ত জেলেপাড়ার আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল।

দুপুরে খেতে বসে কথাটি পাড়ল গঙ্গাপদ। মাটির মেঝেতে পিঁড়ির ওপর বসেছে সে। ভাত প্রায় অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেছে তার। কাঁসার গ্লাসে পানি ঢালছে ভুবন। গঙ্গা দু'চোখ খুলে মাকে দেখছে। রোদে পুড়ে মায়ের হাত ও মুখের চামড়া ঝল্‌সে গেছে। সেই সুন্দর পা দুটোতে অযত্নের ছাপ সুস্পষ্ট। হাতের আঙ্গুলগুলোর নখ ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে। মাকে নিবিড়ভাবে দেখতে দেখতে এতদিন মনের মধ্যে গুমরে মরা কথাগুলিই বলল গঙ্গা, 'মা, আঁই আর পইত্যাম নো।'

ভুবন হা-হয়ে গেল। চোখ তুলে তাকালো গঙ্গার দিকে। সেই চোখে অবাক জিজ্ঞাসা।

'মা তোঁয়ার কষ্ট আঁই আর সহ্য গরিত নো পারির। পড়া ছাড়ি দি আঁই তোঁয়ারে সাহায্য গইজ্যম। বহদ্দারত্তোন কিনা মাছ আঁই কাঁধত গরি বাজারত লই যাইয়্যম, তুঁই বেচিবা, তোঁয়ার কষ্ট কম অইবো মা।' সুযোগ পেয়ে একনাগাড়ে কথাগুলো বলে ফেলল গঙ্গাপদ।

ভুবন কিছুই বলল না। শুধু দুফোটা টলটলে জল চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল। মায়ের এ কাঁদার অর্থ গঙ্গা বুঝল না, ভুবনও বোঝালো না।

সেদিন বিকেলে উত্তরপাড়ায় বায়স্কোপ দেখানোর লোক এসেছে। খাল অতিক্রম করে এপাড়ে আওয়াজ ভেসে এল—

আকার দ্যাখে বাহার দ্যাখো,
লাভলু মিয়ার বায়স্কোপ দ্যাখো।
লন্ডনের অ বিল্ডিং দ্যাখো,
লাল লাল মেমসাব দ্যাখো।
দ্যাখো দ্যাখো তাজম'ল দ্যাখো।

ভাটার সময় পার্শ্ববর্তী খাল থেকে পানি একেবারে নেমে যায়। পায়ের পাতা ডুবানো পানি অতিক্রম করে পূর্বপাড়ার বাচ্চাকাচ্চারা, বালক-বালিকারা ছুটছে সেই বায়স্কোপ দেখার জন্যে। এক আনায় পাঁচ মিনিটের শো। গঙ্গাও মায়ের কাছ থেকে একটি আনি সংগ্রহ করে দৌড় লাগালো খালের দিকে।

ধনবাঁশি দাওয়ায় বসে জাল বুনছিল। গঙ্গার দৌড় দেখে মুখে 'ঝুক্' বলে একটা চাপা আওয়াজ করল। আর ডান হাতের তর্জনিটা গঙ্গার দিকে উঁচিয়ে ধরল। এবং তখনই ধনবাঁশির পালিত হিংস্র কুকুরটি ঝাঁপিয়ে পড়ল গঙ্গার ওপর। কুকুরের ঝাপটায় গঙ্গা খালের পানিতে পড়ে গেল। কুকুরটি তার শরীর থেকে খাবলা খাবলা মাংস তুলে নিতে লাগল। কুকুরটির হিংস্র আওয়াজে পাড়ার আরও

কয়েকটি কুকুর এসে জুটল। গঙ্গা প্রথম কয়েক মিনিট চিৎকার করলেও পরে নিস্তেজ হয়ে গেল। খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েরা তারস্বরে চিৎকার শুরু করল। ভুবন যখন গঙ্গার কাছে পৌছালো, তখন সে আধমরা। ধনবাঁশি জলে-কাদায় মাখানো অর্ধমৃত গঙ্গাকে পাঁজাকোলা করে খাল থেকে তুলে এনে ভুবনদের দাওয়ায় শুইয়ে দিল।

উন্মাদিনীর মতো ছুটল ভুবন রসমোহন ডাক্তারের বাড়িতে। ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুঁই আঁর ধর্মের বাপ, তুঁই আঁর পোয়ারে বাঁচাও।'

রসমোহন কবিরাজ। ভুবনের মুখে বিবরণ শুনে কিছু ওষুধ ব্যাগে গুছিয়ে নিলেন। সেই ব্যাগ মাথায় নিয়ে ভুবন ছুটল নিজ বাড়ির উদ্দেশে। পেছনে পেছনে এলেন বৃদ্ধ রসমোহন ডাক্তার।

ভুবনদের উঠান ভরে গেছে নানা বয়সের নারীপুরুষে, বালক-বালিকায়। জয়ন্ত বালতির পানিতে গামছা চুবিয়ে চুবিয়ে গঙ্গার শরীরের নানা অংশ থেকে কাদা পরিষ্কার করছে। আর গুনগুন করে গাইছে—

বড় দুঃখের কথা সবল আজি,
প্রাণ খুলে কই তোমার কাছে।
ভাইরে, আমার মত জনম দুঃখী,
এ সংসারে আর ক'জন আছে?

রসমোহন ডাক্তার ক্ষত অংশগুলো তুলো দিয়ে পরিষ্কার করলেন, নানা ভেষজ একত্রে পিষে সেই ক্ষতে লাগালেন। চারটা বড়ি পানি সহযোগে খাইয়ে দিলেন। আট-দশটা কলাপাতা কাটিয়ে আনালেন। সেই পাতা পাটির ওপর বিছিয়ে তার ওপর গঙ্গাকে শুইয়ে দিলেন। যাওয়ার সময় ভুবনকে বললেন, 'ব্যাপারগান খুবই জটিল। কুকুরের কামড়, বড়ই বিপজ্জনক। আগামী সাতদিন চোগে চোগে রাইখ্যো। সাতদিন টিগিলে বাঁচি যাইবো গই. যা কিছু হওনর সাতদিনের মধ্যেই অইবো। কালিয়া বিয়ানে যাই আঁক্তুন ঔষধ লই আইস্যো।'

ভুবন পাঁচ টাকার একটা নোট এগিয়ে দিলে রসমোহন ডাক্তার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'আঁরে কসাই ভাইব্যো যে না? বিধবাক্তুন এই বিপদত টিঁয়া লইতাম? আঁর ব্যাগগান্ পৌছাই দওনর ব্যবস্থা গর।'

জয়ন্ত এগিয়ে এসে ব্যাগ হাতে নিল। বলল,'ডাক্তাররে আঁই পৌছাইদি আই মামী।'

এই জয়ন্ত নিতান্ত দরিদ্র একজন জেলে। সবল কিন্তু নিষ্কর্মা। জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রথম বউটা মারা যাবার পর পাখিবালাকে সাঙ্গা করেছে। পাখির ডান চোখটা কানা, সারা মুখে বসন্তের দাগ, চিপচিপে গড়ন। গায়ের রঙ কালো। জয়ন্ত রাতকানা। কোনো এক অজানা কারণে সন্ধ্যা হলেই তার মনে হয়, অসংখ্য মশা তার হাতে-পায়ে-মুখে কামড়াচ্ছে। তাই সন্ধ্যা লাগতেই দুই হাতের তালুতে

কেরোসিন নিয়ে সে বাহুতে পায়ে মুখে মাখতে থাকে। রাত নামলে সে একেবারে অন্ধ হয়ে যায়। সে সাধারণত লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে। হাফ-হাতা গেঞ্জি ও ধুতিও পরে মাঝেমধ্যে। নতুন জামা কাপড় কিনেই সে গাবের পানিতে চুবায়। ফলে তার সবধরনের পোশাকের রঙ খয়েরি। জিজ্ঞেস করলে বলে, 'ময়লা অইলে বুঝা নো যা। হেতল্যাই গাবত চুবাইদে।'

তার কোনো নৌকা-জাল নেই, বউটিও বিয়ারির কাজ করে না। প্রায় প্রতি সকালে জয়ন্ত হুরিজাল নিয়ে বের হয়। সমুদ্রের কূলে কূলে ঠেলে। করকইজ্যা ইচা, মাঝেমধ্যে দু'চারটা সুন্দরী, তপসে, পোপা ধরা পড়ে তার জালে। সেগুলোই বাজারে বিক্রি করে তার বউ। দুজনের জীবন চলে যায় এভাবে।

মাঝে মাঝে একটা গভীর উদাসীনভাব জাগে জয়ন্তর মনে। তখন সে জাল বাওয়া বন্ধ করে দেয়। দাওয়ায় বসে গুনগুনিয়ে গান করে, বিচ্ছেদ গান—

অতি যত্নের শুয়া পাখি গেল আমায় ছাড়ি,
পাখির বিরহ জ্বালা সইতে না পারি।
এমন বান্ধব কেবা আছে পাখি দিবে ধরি।
যে ভাবেতে ডাকতাম পাখি, সেভাবে দিত সাড়া,
কেমন করে শিকল কেটে পাখি রে দিল উড়া।
তার জন্যেতে আত্মহারা মরেতে থাকতে নারি।

জয়ন্ত তার প্রথম বউকে খুব ভালবাসতো। বুঝিবা তার জন্যেই এই বিরহ।

জয়ন্ত মানুষের উপকার করে বেড়ায়। মালতির মা মাছের ভারি খাড়াংটা মাথায় তুলতে পারছে না, জয়ন্ত তুলে দিচ্ছে। রামনারায়ণ বহদ্দারের জালের ভারটা সমুদ্রে নিয়ে যাওয়ার লোক একজন কম, সেখানে জয়ন্ত উপস্থিত। গোপালের মাছ বাছতে বাছতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, জয়ন্ত এগিয়ে হাত লাগিয়েছে। পুকুরঘাটে বৃদ্ধ চৌরাশির বাপ আছাড় খেয়ে পড়ে আছে, দৌড়ে গিয়ে জয়ন্ত তাকে পাঁজাকোলা করে বাড়িতে পৌছে দিচ্ছে। এতেই জয়ন্তর সুখ।

এই জয়ন্ত আজ ভুবনের বিপদে হাজির হয়েছে। অনেক রাতে বাড়ি ফিরে গেল জয়ন্ত। যাবার সময় বলে গেল, 'মামী, কষ্টে সিষ্টে রাতগান্ কাডাই দও। বিয়ানে আঁই আবার আইস্যম।'

পরেরদিন সকালে ভুবন মাছ বেচতে গেল না। বংশীর মা ডাকতে এসে ফিরে গেল। সর্বক্ষণ ছেলের পাশে বসে রইলো সে। প্রবল জ্বরে কাঁপছে গঙ্গা। মাঝেমাঝে ব্যথায় ককিয়ে উঠছে। জয়ন্ত এলে ভুবন রসমোহন ডাক্তারের কাছে গেল।

দিন তিনেক পর ক্ষতগুলোতে পুঁজ জমা হতে শুরু করল। রসমোহন ডাক্তার আবার এলেন। দেখেশুনে বললেন, 'তোঁয়ার উঅদ্দি ঈশ্বরর আশীর্বাদ আছে, ফাড়া কাডি গেইয়ে গই। তোঁয়ার পোয়া এইবার ভালা অই উডিবো।'

ডাক্তারের কথা শুনে ভুবনের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। এই দীর্ঘশ্বাস স্বস্তির না বেদনার বোঝা গেল না।

দিন চারেক পরের একদিন সকালে জয়ন্তর বউ বলল, 'তুঁই দে জালটাল বাওন ছাড়ি দি দিন রাইত গঙ্গাপদর হেডে বই থাগ, দিন চলে কেএন গরি? খবর রাইখ্যো নি? '

জয়ন্ত বলল, 'তোঁয়ার দিন তুঁই চালাও। আঁর দিন কেএন গরি চলিবো নো জানি। এ রইম্যাই চলিবো। আঁই এই রইম্যাই। মানুষর বিপদর সমত সামনে থিয়ানই আঁর সুখ। হেই সুখ লইয়েরে আঁই বাঁইচতাম চাইর। তুঁই হেই সুখ কাড়ি নো লইও।'

'আঁইতো তোঁয়ারে কোনোদিন বাধা নো দি। ঘরের মইধ্যে কোনো চইল-ডাইল নাই। বাধ্য অইয়েনে আজিয়া তোঁয়ারে কইদ্যো'—জয়ন্তর কানাবউটি বলল। তার ভাল চোখটিতে সহানুভূতির ছোঁয়া।

'ঠিক আছে। আজিয়া আঁই হরিজাল বাইতাম যাইয়্যম, পানিভাত আছেনি চাও, দু'য়া ভাত দও।' বলল জয়ন্ত।

এইভাবে দিন গড়িয়ে যায় রাতের দিকে, রাত এগোয় সকালের দিকে। এইভাবে দিন ফুরায়, সপ্তাহ ফুরায়, মাস ফুরায়। গঙ্গা মৃত্যুশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

কারো বিয়ের লগ্ন এলে জয়ন্তর কাজ বেড়ে যায়। এপাড়ার বৈরাগী ঢুইল্যার একটা বাদনদল আছে। বিয়ে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে এই দলটি বাজনা বাজাতে যায়। জয়ন্ত এই দলে সানাই বাজায়। বৈরাগী বাজায় ঢোল, ছেলে অনিল ডগর বাজায়। কাঁসা বাজাবার জন্যে সামনে যাকে পায়, তাকেই নিয়ে যায় বৈরাগী। আশ্বিনের শেষ তারিখের একটা বিয়ের বায়না নিয়েছে বৈরাগী। রাউজানের বেতাগীর সদাশিব ভট্টাচার্যের ছেলের বিয়ে।

জয়ন্ত বৈরাগীকে বলল, 'কাঁসা বাজাইবাল্যাই গঙ্গাপদরে লইলে তোঁয়ার কোনো আপত্তি আছে না অনিলের বাপ?'

'আঁর কি আপত্তি, তই বাজাইত পারিবো নি হিতে?' বৈরাগী জিজ্ঞেস করল।

জয়ন্ত সন্তুষ্টির সুরে বলল, 'আঁই শিখাই পড়াই লইয়্যম। বঅর দুক্কিত্তা, হিতারে লইলে ইক্কিনি সাহায্য অইবো।'

জয়ন্ত গঙ্গাকে রাজি করাল, কাঁসা বাজানোর পদ্ধতিটা যদ্দুর সম্ভব শিখিয়ে দিল তাকে।

রাত প্রায় দশটায় বিয়ের লগ্ন। বর কনে বেদির সামনে বসেছে। ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে বিয়ের কাজ শুরু করলেন। বৈরাগী ও তার দল সামান্য দূরত্বে দাঁড়িয়ে বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে। সকালের দিকে এসে পৌছেছিল তারা,

এসেই প্রায় দু'ঘণ্টা একাক্রমে বাজাতে হয়েছে। একটু বিশ্রাম নিলেই একজন এসে বলে, 'বই কা রইয়ো, বাজাও বাজাও।'

আবার বাজনা শুরু করে বাদনদল। অভ্যস্থ হাতে বাজাতে থাকে বৈরাগী, অনিল ও জয়ন্ত; কিন্তু দীর্ঘসময় কাঁসা বাজাতে বাজাতে হাত টনটন করছে গঙ্গার। তবুও মুখ কাঁচুমাচু করে বাজিয়ে যাচ্ছে সে। মনে মনে বলছে, 'আত্তোন পারন পড়িবো।'

ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচ্চারণের ফাঁকে ফাঁকে বললেন, 'জোয়ার বাদ্য গর।'

বিবাহিত নারীরা উলুধ্বনি দেয়া শুরু করে, বাজনাদাররা গলদঘর্ম হয়ে বাজাতে থাকে।

বিয়েবাড়ির উঠানের ওপর ছাউনি দেয়া হয়েছে। অভ্যাগতরা সেই ছাউনির নিচে খাওয়া শুরু করেছে। চাচিতে বসে সিলভারের থালায় খাচ্ছে তারা। খেয়ে একদল উঠে গেলে দু'চারজন এসে উঠানময় ছড়ানো এঁটো পরিষ্কার করে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর বসছে অন্যদল।

বিয়ে শেষ হয়ে গেছে অনেক আগে। উঠানে আর খাওয়ার লোক নেই। বৈরাগীরা একপাশে জড়সড় হয়ে বসে আছে। এখনো অভুক্ত। তাদেরকে কেউ খেতে ডাকেনি। অবশেষে গৃহকর্তার চোখ পড়ল তাদের ওপর। চেঁচিয়ে বললেন, 'অ প্রদীপ, ঢুইল্যা অলভ আইজো নো খা পাআনলার। হিতারারে খাইতো দও না।'

এই কথা বলার আরও আধঘণ্টা পরে বাজনাদারদের খেতে দেয়া হল উঠানের এককোনে, আঁস্তাকুড়ের পাশে। একটা বাঁশ পেতে দেয়া হয়েছে। বাঁশের ওপরই বসেছে তারা। কলাপাতায় খাবার দেয়া হয়েছে। ভাতের ওপর ডাল, ঘণ্ট ও একটুকরো করে মাছ। অতিথিদেরকে নানা লোভনীয় খাবার পরিবেশন করলেও ঢুইল্যাদের ভাগ্যে তা জোটেনি। এরা এ সমাজে অস্পৃশ্য। বিয়ের অনুষ্ঠানে এরা অপরিহার্য বটে, কিন্তু বর্ণবাদিতার নিরিখে এরা অচ্ছুত, নিম্নবর্গীয়।

দূর থেকে বাড়ির কর্তা আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অ প্রদীপ, ঢুইল্যা অলেরে কও, খাওনর পরে আঁইডা আর কলাপাতা যেএন খালপাড়ত পেলাই দি আইয়্যে। হিতারার আঁইডা কেউ ছুঁইতো নো।'

সদাশিব ভট্টাচার্যের এসব কথায় বৈরাগী-জয়ন্ত নির্বিকার। কিন্তু গঙ্গা বিস্মিত। বোকা বোকা চেহারা নিয়ে সে এসব কথা মনোযোগ সহকারে গিলে খাচ্ছে।

'সদাশিব বাউ আছন না?' বলতে বলতে উঠানে এসে দাঁড়ালেন আবদুর রহমান সাহেব। মাথায় টুপি, লম্বা দাড়ি; আজানুলম্বিত পাঞ্জাবি গায়ে তার।

'আরে চেয়ারম্যান সাব যে। পোয়ার বিয়াত আইবারল্যাই আওনেরে নিমন্ত্রণ করি আইলাম। বিয়ার সমত আওনে নো আইলেন।' কথাগুলো গদগদ কণ্ঠে বলতে বলতে দ্রুত এগিয়ে এলেন সদাশিব বাবু।

চেয়ারম্যান সাহেব নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, 'আর নো কইঅন, দইনপাড়া গেএলাম দে এক্‌খান্‌ বিচার গরিবাল্যাই, আইতে আইতে দেরি অই গেইয়ে। তই বিয়াগান ঠিক মত হইয়েনি?'

সদাশিব ভট্টাচার্য বললেন, 'খুব ভালামত শেষ হইয়ে। অ প্রদীপ, চেয়ারম্যান সাবর খাইবার বেবস্থা গর।'

'না না, আঁই নো খাইয়্যম। রাইত অই গেইয়ে গই। তাছাড়া, কিছু মনে নো গইজ্যন। হেঁদোর বাড়িত খাওন আওনর ভাবী পছন্দ নো গরে।' কথাগুলো স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে গেলেন চেয়ারম্যান আবদুর রহমান চৌধুরী।

'তইলে মিষ্টি, চা দেউক।'

'না, এক গেলাস পানি দঅন।'

পানির গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বিদায় নিলেন চেয়ারম্যান। তার যাওয়ার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন সদাশিব ভট্টাচার্য। চোখের দৃষ্টিতে নানা কথার কারিকুরি। মুখে উচ্চারণ করলেন, 'শা—লা।'

দুদিন পর ফিরে এসে দশ টাকার একটা নোট মায়ের দিকে এগিয়ে দিল গঙ্গাপদ। ভুবন নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল গঙ্গার দিকে। নোটটি ধুতির কোনায় বাঁধতে বাঁধতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভুবন, মুখে কিছুই বলল না।

আমারবই.কম

সকালের পড়ালেখা শেষ। কিন্তু দীনদয়াল ছাত্রছাত্রীদের ছুটি দিল না। বলল, 'তোঙ্গর এখন ছুডি নাই। আঁর লগে এক্‌খান কাম করন লাইগবো তোঙ্গত্তুন।'

'কী কাম ছেয়ার?' সমস্বরে জিজ্ঞেস করল ছাত্রছাত্রীরা।

'এক্‌খান্‌ পথ বাঁধন লাইগবো।' হাতে কোদাল ও চুপড়ি নিতে নিতে বলল দীনদয়াল।

খালের পুল অতিক্রম করে জেলেপাড়ায় ঢুকবার মুখে হাত দশেক পথ ভেঙে গেছে। গর্ত হয়ে পানি জমে আছে সেখানে। সেই কাদাময় জল মাড়িয়ে জেলেরা যাতায়াত করে। মেরামত করার গরজ নেই কারো। দীনদয়াল গতকালই ঠিক করে রেখেছিল আজকে ছুটির পর সে ভাঙা পথটিতে মাটি ঢেলে উঁচু করে বাঁধিয়ে দেবে। আজ তাই পড়ুয়াদের নিয়ে সেই রাস্তা মেরামত করতে এসেছে দীনদয়াল। খালের পাড় থেকে সে মাটি কেটে দিচ্ছে, পড়ুয়ারা টুকরি করে আর হাতে হাতে সে-মাটি ভাঙা পথটিতে এনে ফেলছে। ঘণ্টা তিনেকের চেষ্টায় সেই ভাঙা পথটি হাঁটার যোগ্য হয়ে উঠল।

জেলেরা সে-পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দীনদয়ালকে বাহবা দিতে লাগল। মঙ্গলীর ঘোর লাগা চোখের রঙ আরো গাঢ় হতে লাগল।

'আঁরার পোয়াঅল লেখাপড়া শিখিবো, নিজের নাম লেইত পারিবো—হিয়ান নো ভাবি কনঅ দিন। আজিয়া দয়াল মাস্টরর দয়ায় জাইল্যাপাড়ার বউত পোয়া

এক লাইন মনসাপুঁথি পড়িত পারের। তুই কি কও গুরুপদর বাপ?' কথাগুলো রামনারায়ণের উদ্দেশে বলল বলরাম।

পড়ন্ত বিকেলে জেলেপাড়ার পার্শ্ববর্তী উঁচু খাস জমিটিতে আট-দশজন জেলে জাল তুনছিলো। গেলো জো'তে ঝড়জল প্রবল ছিল বলে অনেকের জাল ফেঁসে গেছে। সেই ছিঁড়ে-যাওয়া জালগুলো মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে মেরামত করছিল তারা।

'ঠিক কথাগান কইও তুঁই। দয়াল মাস্টর আসলে আঁরার বউত উপআর গরের।' বলরামের কথা শুনে বিজন বহদ্দারের জাল তুনতে তুনতে গোপাল বলল।

কামিনী বলল, 'এ-ন উগ্গা উপআরি মানুষর উপআর গরন আঁরার উচিত। পড়ইন্যা বেয়াগ ছাত্রঅল পতি মাসত কিছু কিছু টিয়া দিলে মাস্টরর আয়-ইনকাম ইক্কিনি বাড়িবো। শক্তিমান পোয়া। শুধু আঁরার উপআরর লাই কোনো জাইল্যাকাম নো গরে।'

রামনারায়ণ এতক্ষণ চুপ করে সবার কথা শুনছিলো। বলল, 'তোঁয়ার কথাগিন ফেলনা নো। তুই আঁরার একার কথা দি তো নো অইবো। বিয়াগুনে মিলি সিদ্ধান্ত লওন পড়িবো। আইয়েদ্দে কোনো সালিশত এ কথাউয়া তুইল্যো। চাই কি গরন যা।'

আমারবই.কম

দশ

'মা জননী, তুঁই ভালা আছনি?' উঠানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন গৌরাঙ্গ সাধু। ভুবন পেছন ফিরে উঠানের উনুনে ফুঁ দিচ্ছিল। আজ ক'দিন হল বৃষ্টি ধরেছে। চারদিকে স্যাঁতস্যাতে ভাব থাকলেও উনুনটা শুকিয়ে গেছে। সেই উনুনে দুপুরের রান্না চড়িয়েছে ভুবন।

'মা জননী' সম্বোধনে পেছনে ফিরে তাকালো সে। দেখল—গৌরাঙ্গ সাধু। বেশভূষায় কোনো পরিবর্তন নেই। শুধু চেহারায় বয়সের ছাপ একটু গভীর হয়েছে। শোভন হাসি তার মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে আছে।

ভুবন উনুনের পাশ থেকে দ্রুত উঠল। গলায় আঁচল জড়িয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল সাধুকে। এই লোকটাকে দেখলে বাপ নৈদরবাঁশির কথা মনে পড়ে ভুবনের। বাবার চেহারাটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে তার স্মৃতিতে। গৌরাঙ্গ সাধু সেই অস্পষ্ট চেহারাকে স্পষ্ট করে তোলেন ভুবনের মনে।

দাওয়ায় একটা পাটি বিছিয়ে দিতে দিতে ভুবন বলল, 'বইঅ সাধু বাবা।'

'না মা, বইতাম নো। বউত কাম। এই জাইল্যা অলেরে জাগান পড়িবো। ঘুম যার। অশিক্ষার ঘুমঅত্তোন জাগান পড়িবো। আইচ্ছা, তোঁয়ার পোয়া কেএন আছে? তার লেয়াপড়া কেএন অর?' পাটিতে বসতে বসতে বললেন সাধু।

একটি দূরাগত দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভুবন বলল, 'আঁর সব আশা আকাঙ্ক্ষা শেষ। গঙ্গা পড়ালেয়া ছাড়ি দিএ।'

অবাক বিস্ময়ে গৌরাঙ্গ সাধু ভুবনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, 'কীআ? ছাড়ি কা দিল?'

ভুবন শ্বশুরের মৃত্যুর কথা, গোলকবিহারীর জায়গা জবরদখলের কথা, গঙ্গাকে কুকুরে কামড়ানোর সেই বীভৎস কাহিনী গৌরাঙ্গ সাধুকে একের পর এক শোনাল। মায়ের কষ্ট লাঘব করার সংকল্পও যে গঙ্গার পড়া ছেড়ে দেবার অন্যতম প্রধান কারণ তাও বলল সে।

সব শুনে সাধু বললেন, 'উগ্গা তাজা ফুল ঝরি গেল গই। উগ্গা মার স্বপ্ন ভাঙি গেল গই। তোঁয়ার পোয়ার পড়া ছাড়ি দওনর সংবাদে আঁই বড়ই দুঃখ পাইলাম মা, বড়ই কষ্ট পাইলাম।'

আমারবই.কম

ভুবনের রোদপোড়া কপোল বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

'এক গেলাস জল দও মা। বউত দূরঅন্তোন আস্যি। বড় আশা লই আস্যিলাম। তোঁয়ার পোয়ার সুখবর লইন্যা। ঈশ্বর আরে হেই সুখঅন্তোন বঞ্চিত গইল্যো।'

আমারবই.কম

জল খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন সাধু। উপর দিকে ডান হাতটা তুলে গৌরাঙ্গ সাধু বললেন, 'তোঁয়ার মঙ্গল হোক জননী, ঠাকুর তোঁয়ার মনর কষ্ট দূর গরুক। আঁই যাই মা, বউত কাম। জাইল্যাঅলরে জাগান পড়িবো, অশিক্ষার ঘুমঅন্তোন জাগান পড়িবো।'

আমারবই.কম

গঙ্গা এখন টাউঙ্গাজাল বায়। হরিজালে মাছ বেশি ধরা পড়লেও হরিজাল বাওয়ার শক্তি সে এখনো অর্জন করেনি। হরিজাল বাইতে হয় সমুদ্রের কূলেকূলে। সেখানে স্রোতের টান, ঢেউয়ের ঝাপটা। এগুলো সহ্য করে সমুদ্রে জাল বাওয়ার মত শক্তিমান গঙ্গা এখনো হয়ে ওঠেনি। টাউঙ্গাজাল বাওয়া হয় খালেবিলে। সেখানে স্রোতের টান নেই, ঢেউয়ের ধাক্কা নেই। তাই খালেবিলে টাউঙ্গাজাল ঠেলে গঙ্গা।

কদিন আগে অন্নচরণের কাছ থেকে একটা পুরনো টাউঙ্গাজাল গঙ্গাকে কিনিয়ে দিয়েছে জয়ন্ত। কী করে ঠেলতে হয়, কী করে কিছুক্ষণ পর পর পায়ের চাপে জাল ওপর দিকে তুলে মাছ হাতিয়ে নিতে হয়, উঠানে জাল বিছিয়ে তা গঙ্গাকে শিখিয়ে দিয়েছে জয়ন্ত। দু'একবার সঙ্গে করে খালেবিলে নিয়ে গিয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণও দিয়েছে। মাছধরা গঙ্গার কাছে এখন অনেক সড়গড় হয়ে গেছে। এখন সে টাউঙ্গাজাল নিয়ে মাছ ধরতে যায়। একা একা—রাতে ও দিনে।

ভুবনকে এখন আর মাথায় করে মাছ নিয়ে বাজারে যেতে হয় না। গঙ্গাই কাঁধে করে মাছ বহন করে। একটা বাঁকের দু'প্রান্তে বাঁশের তৈরি দুটো চুপড়ি বেঁধে ভার তৈরি করা হয়েছে। মাছভর্তি সেই ভার বয়ে নিয়ে যায় গঙ্গা, সঙ্গে

থাকে তার মা। নানা পাড়ার গলিতে ঘুরতে ঘুরতে ডাক দেয়, 'মাছ লইবা না মাছ? ভালা লইট্যামাছ, চিঙ্কা ইচা। ই-লি-শ মাছ।'

সমুদ্রে গিয়ে বহদ্দারদের কাছ থেকে আগেরই মতো মাছ কেনে ভুবন। তবে পরিমাণে বেশি। আগে মাথায় করে মাছ বইতে হতো বলে খুব বেশি মাছ কিনতো না। এখন ছেলে বহন করে, আর দুই চুপড়িতে মাছ ধরে বেশি। তাই বেশি কেনে। লাভও আগের তুলনায় বেশি হয়। সমুদ্রকূল থেকে হিন্দু-মুসলিম পাড়াগুলো কম দূরে নয়। গঙ্গার শারীরিক গড়ন খুব সুদৃঢ় নয়। তাছাড়া, জীবনের প্রথমদিকে সে এসব কাজে নিয়োজিত ছিল না। এখন ভারে করে পাড়ায় পাড়ায় মাছ বহন করে ঘুরতে তার খুব কষ্ট হয়। বাঁকের চাপে কাঁধের দু'পাশে ফোস্কা পড়ে গেছে। ডানকাঁধের ফোস্কা গলে গিয়ে ঘায়ের মতো হয়েছে। ভার বইতে গিয়ে বড় ব্যথা লাগে সেখানে। মায়ের কাছ থেকে এই ব্যথার ব্যাপারটি সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে সে। মা জানতে পারলে তাকে ভার বইতে দেবে না। মা আবার মাথায় মাছের খাড়াং তুলে নেবে।

বংশীর মা বলে, 'তোঁয়ার কষ্ট কমি আইস্যে গঙ্গার মা। পোয়া ভারত্ গরি মাছ লই যা। তোঁয়াত্তোন এখন আর বঅন গরন নো পড়ে। ভগমান তোঁয়ারে ফিরি চাইএ।'

'আঁইতো এই সুখ নো চাই বদ্দি। ভগমানত্তোন যিয়ান চাইলাম, হিয়ান নো দে। পোয়াউয়া নো পইল্যো। কিছুদিন পর বাপর মতো দইজ্যাত যাইবো। আর ... আর ডুবি মরিবো।' গভীর দুঃখমিশ্রিত এই কথাগুলো ভুবনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।

'কী আর গরিবা, কোআদর লেখা মানি লওন ছাড়া আঁরার কোনো উপায় নাই।' বলল বংশীর মা।

কপালের লেখা বলেই মেনে নেয় ভুবন। কিন্তু মাঝেমধ্যে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পাড়ায় পাড়ায় মাছ বিক্রি করতে গিয়ে সে অনেক পরিবারকে চিনেছে, তাদের আর্থিক দুরবস্থা সম্পর্কে জেনেছে। আর্থিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত অনেক পরিবারের ছেলেসন্তানরা বই হাতে স্কুলে যায়, পড়াশোনাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। অসচ্ছলতা সে-সব পরিবারের সন্তানদের বিদ্যার্জনে প্রতিবন্ধক হচ্ছে না। তারা যদি পারে,তাহলে গঙ্গা পারল না কেন? ভুবনরা দিন এনে দিন খায়। কিন্তু আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারটি ভুবন ঘুণাক্ষরেও কোনোদিন গঙ্গাকে বুঝতে দেয়নি। তাহলে কেন গঙ্গা পড়া ছাড়ল? এটাকেই কি কপালের লিখন বলে? এই সমাজটা কি অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবে না? গঙ্গাকে দিয়ে সে এই পাড়ায় সেই মুক্তির চেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রচলিত নিয়মই জয়ী হল। জেলেরা শুধুই মাছ ধরবে? বিদ্যার্জন তাদের জন্যে নয়? এসব কথা এলোমেলোভাবে ভাবে ভুবন। তার একান্ত নিজস্ব সময়গুলো সে এসব ভেবে ভেবে কাটায়।

আমারবই.কম

পূর্ণিমার জো। উন্মাদ বাতাস বইছে—শোঁ শোঁ। জোয়ারের প্রবল টান। আকাশ ঘোর মেঘলা। কিছুক্ষণ পর পর ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করে বৃষ্টি নামছে। হা-হা করে দানব-ঢেউ এগিয়ে আসছে। জেলেনৌকাগুলো সেই ঢেউ-এ লাফাচ্ছে। জেলেরা ঝড়জলে কাতর। পাতায় পাতায় সার সার নৌকা বাঁধা। জালের সঙ্গে প্রতিটি নৌকা দীর্ঘ রশি দিয়ে বাঁধা। রশির একপ্রান্ত নিয়ে টংজালগুলো স্রোতের টানে জলের তলায় চলে গেছে। অন্যপ্রান্তে বাঁধা নৌকাগুলো টালমাটাল, অবিরাম লাফিয়ে যাচ্ছে। সকালে জোয়ার শুরু হবার আগ-মুখে এসে জেলেরা নৌকাগুলো জালের সঙ্গে বেঁধেছে। ঘণ্টা তিনেকের জোয়ারের পুরো সময় এরা জালের সংলগ্ন থাকে। এরা একে ঘাই বলে। স্রোতের টান যখন প্রবলতম হয়,বাতাস থাকে অসংলগ্ন, তখনই জেলেরা ঘাই-এ থাকে। বিপ্রতীপ ঝড়জলের জন্যে তখন কূল থেকে আসা যায় না। আসতে না পারলে মাছ পচে, জলদাসদের উনুনে আগুন জ্বলে না। তাই এরা জীবন বাজি রেখে ঘাই-এ থাকে। আজও প্রায় সব নৌকা ঘাই-এ আছে।

পূর্ণ বহদ্দার ও বিজন বহদ্দারের নৌকা পাশাপাশি। অন্যান্য নৌকাগুলো একটু দূরে দূরে। পূর্ণর নৌকায় তার তিন পুত্র ও দু'জন গাউর। গাউররা মাঝেমধ্যে নৌকার তলা থেকে পানি সেঁচছে। বিজন আজ নিজে ঘাই-এ এসেছে। তার নৌকায় চারজন গাউর। জোয়ারের টান শুরু হয়ে এসেছে। জালগুলো ভেসে উঠতে আর খুব বেশি দেরি নেই। বিজন একজন গাউরকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'পানির রঙ দেইখ্যস্‌নি সান্যা। ঘোলা। এই ঘোলা পানি ইলিশর পানি। মনে অর আজিয়া মাছ বেশি পড়িবো। তুই কি কস্‌?'

পানি সেঁচতে সেঁচতে সাধন বলল, 'আকোনঅ হেরইম্যা মনে অর। নাআর কিনাদ্দি আঁই দুআ চাউরগা ইলিশমাছ ফালাইতে দেখ্যি।'

কিছুক্ষণ পর উত্তাল ঢেউয়ের মাথায় টংজালগুলো ভেসে উঠতে লাগলো। জালের সমস্ত শরীরে ইলিশমাছ আটকে আছে। দূর থেকে মনে হয় শাদা শাদা শাপলা জালগুলোর গায়ে লেপ্টে আছে। সব নৌকার জেলেরা ঢেউ ও বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে জাল থেকে মাছগুলো খুলে নিতে লাগল। ইলিশের কানকোর আঘাতে তাদের হাত রক্তাক্ত হতে লাগল। এই আঘাত তাদের গায়ে ব্যথার সঞ্চার করল না। বরং আনন্দের শিহরণ তুলল।

মাছ খুলে নেয়ার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভাটার টানে জালগুলো জলের নিচে যেতে শুরু করেছে। নৌকাগুলো রুপালি ইলিশের ভারে প্রায় ডুবোডুবো। ঠিক এই সময়ে সেখানে আচমকা উপস্থিত হল সাত আটটি সাম্পান। প্রত্যেক সাম্পানে ছয়-সাত জন করে মানুষ। মানুষ নয়, জলদস্যু। গহিরার এই জলডাকাতরা বঙ্গোপসাগরে ডাকাতি করে বেড়ায়। কখনো পণ্যবাহী বড় নৌকায়, কখনো জেলেদের নৌকায়। নোঙর-করা বিদেশি মালবাহী জাহাজেও চুরি করতে

ওঠে তারা। শিকল বেয়ে ডেকে উঠে প্লাস্টিকের মোটা রশি কেটে নিচে ফেলে দেয়, সাম্পানে অপেক্ষমান দস্যুরা কর্তিত রশি সাম্পানে বোঝাই করে। সিকিউরিটি গার্ডরা তাড়া করলে ডেক থেকেই উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়। কখনো মরে, কখনো বাঁচে।

আজ এরা লুঠ করছে জেলেনৌকা। প্রত্যেকের হাতে লাঠি, পাথরের টুকরা। কিরিচও আছে কারও কারও হাতে। মুখে অবিরাম গালিগালাজ। দুটো সাম্পান বিজনের নৌকার কাছে এগিয়ে এসেছে। গাট্টাগোট্টা চেহারার একজন চিৎকার করে বলছে, 'এই চোত্‌মারানির পোয়াঅল, মালাউনের বাইচ্চা, মাছ এন্তে তুলি দে। নো অইলে খালাই ফেলাইয়্যম খানকির পোয়াঅল।'

বিজনের মাথায় লাঠির প্রচণ্ড আঘাত করে একজন। 'মারে বাপরে' বলে বিজন নৌকাতেই কাত হয়ে পড়ে যায়। গাউররা ভয়ে মাছগুলো দ্রুতবেগে সাম্পানে তুলে দিতে থাকে। ডাকাতরাও লুণ্ঠনকাজে হাত লাগায়।

অতি অল্পসময়ের মধ্যে জেলেদের নিঃস্ব করে দিয়ে সাম্পানগুলো দূরে ভেসে গেল। অধিকাংশ জেলেনৌকাই আজ লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খেয়েছে অনেকে। বিজনের মাথা ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। সাধন ফাটা-অংশে তামুক লেপ্টে গামছা দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। রক্ত পড়া একটু থামলেও বিজন কুঁকড়ে আছে ভয়ে।

সমুদ্রের কূলে একটা মর্মান্তিক হাহাকার পড়ে গেছে। মাছবিয়ারি, দাদনদার তো আছেই, খবর পেয়ে জেলেপল্লী থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, গৃহবধূরাও উপস্থিত হয়েছে সেখানে। কোনো কোনো জেলেনি বিলাপ করছে, 'ওমা, ঈশ্বর আঁরে কি গইল্য, আঁর পোয়ার মাথা ফাডি দরদর গরি রক্ত পড়ের রে ভগমান।'

আবার কেউ চিৎকার করে বলছে,'খোদার কুঅর নামি আইয়্যুক জাবাব উঅর। আঁর জামাইর হাত যে এ-ন গরি ভাঙি দিএ, হিতার পোয়া ঈশ্বরে কাড়ি লউক।'

বিজনের মত আরও চার-পাঁচজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে জলডাকাতরা; গোলকবিহারীর গাউর হারাধনের ডানহাতটা ছেঁচে দিয়েছে। ডানহাতে ভিজে গামছা জড়িয়েছে সে। পূর্ণ বহদ্দারের বড়ছেলে রামপদ মাছ দিতে চায়নি। দাঁড়ের জোর আঘাতে একজন ডাকাতের চোয়াল ভেঙে দিয়েছে সে। ফলে রামপদকে চার-পাঁচজনে মিলে বেদম পিটিয়েছে। পিটানোর পর তাকে পানিতে ফেলে দিয়েছে। মেজছেলে ঘাই-এর লম্বা রশিটি তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কোনোরকমে জান বাঁচিয়েছে। রামপদ ভীষণ ভয় পেয়েছে। সে একেবারে চুপ মেরে গেছে। কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ধীর পায়ে সে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেছে। গোটা সমুদ্র-উপকূল জুড়ে এক বেদনাময় ভীতি-জাগানিয়া পরিবেশ। খণ্ড খণ্ড কথা, চিৎকার চেঁচামেচি, বিলাপধ্বনি মিলে হুলুস্থুল কাণ্ড।

আমারবই.কম

মাগইন্যার ওই ঘটনার পর দীর্ঘদিন বাপের বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না উর্বশীর। গর্ভবতী ছিল বলে বাপের মৃত্যুসংবাদ পেয়েও সে উত্তর পতেঙ্গায় আসতে পারেনি। আজ দীর্ঘদিন পর হরিবন্ধুর মেয়ে উর্বশী বাপের বাড়িতে এসেছে। সঙ্গে চারটা ছেলেমেয়ে। চারটাই বাঁদর। বর্বরতা তাদের রক্তে মিশে আছে। ছানাপোনা নিয়ে সকালে কাট্টলি থেকে হাঁটা দিয়েছিল উর্বশী। দুপুর নাগাদ উঠানে পা দিয়েই বিলাপ ধরেছে, 'অ বাপ্‌রে, আঁরে ছাড়ি কডে গেলারে বাপ।'

বিলাপ ছেড়ে আঁচলে চোখ মুছলো সে। তাকিয়ে দেখল—পুকুর থেকে ভিজে কাপড়ে ঘরে ঢুকছে ভুবন। উর্বশী তার সামনে গিয়ে টুপ করে একটা প্রণাম করল, 'অ ভইচ্‌, ভালা আছনি?' মাগইন্যার নিদারুণ বর্বরতার কথা বেমালুম চেপে গিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল উর্বশী।

'ঠাউরে যেএন রাইখ্যে। আইয়ো, ঘরত আইয়ো।' অতীত দুঃখটাকে মনের ভিতর একটা বড় পাথর দিয়ে চাপা দিতে দিতে বলল ভুবন।

গঙ্গা টাউঙ্গাজাল বেয়ে বাড়ি ফিরে দেখল, চারচারটা মূর্তিমান মর্কট ঘরময় কিলবিল করছে। কেউ ঘরের চাল ধরে দোল খাচ্ছে, কেউ দাওয়া থেকে উঠানে লাফ দিচ্ছে, কেউ আবার ভুবনের পালিত হাঁসকে ঢিল ছুঁড়ছে। ভুবন দুইজ্যা থেকে মাছগুলো চুপড়িতে ঢালল। চিড়িং, চিংড়ির সঙ্গে চারপাঁচটা বড় কাঁকড়া ও একটা পাঙ্গাসমাছ। বাজারে বেচলে বেশ কয়েকটা টাকা আয় হবে। এইসময় উর্বশীর একটা ছেলে নাকিসুরে বলল, 'মা, আঁই কেঁএড়া খাইয়্যাম।' মাথাতোলাটা বলল, 'ওমা, চিড়িংমাছ নো খাইদে বউত দিন অইয়ে।'

উর্বশী ভুবনকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'অ ভইচ, পাআঁশমাছ ইবা বেশি গরি মরিচ দি রাঁধ। আঁর পোয়ামাইয়াগুন যেএন ইক্কিনি কইলজা ডুবাই খাইত পারে।'

ভুবনের শরীরটা ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় রিরি করতে লাগল। কিন্তু মুখে হাসিটা ধরে রাখলো সে।

বিকেলবেলায় দেখা গেল বারান্দার দড়িতে ঝুলানো গঙ্গার গামছায় একজন নাকের শ্লেষ্মা মুছছে। একেবারে ছোট মেয়েটা ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছে। আর মাথাতোলাটা কাদা-মাড়ানো পা পরিষ্কার করছে ভুবনের পরনের কাপড় দিয়ে। বাঁদরগুলো ধমকের কোনো ধার ধারে না। গঙ্গাপদ মায়ের কাছে গিয়ে বলে, 'মা, আর তো সইত নো পারির। মাগইন্যা হারামজাদা এতবড় অপরাধ গরনর পরও তুঁই ইতারারে ঘরত জাগা দিঅ।'

ভুবন বলল,'কীত্তাম। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। জাগা নো দিলে দীর্ঘশ্বাস ফেলাইবো। আর, কুজড়া মাগইন্যা বলে কুসুমির ঘটনার পর নিখোঁজ। এতদিন পরও হিতার হদিস নো মিলে। ইনাইবিনাই আঁরে কথাইন হুনাই দিএ মাগইন্যার মা।'

ভুবন বাচ্চাদের বাঁদরামির কথা ননদকে বললে ইনিয়েবিনিয়ে সে তাদের মানা করে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? উর্বশীর বকুনিটা বকুনির মতো শোনায় না। মনে হয় মানা করতে হয় বলেই করছে। ভর্ৎসনায় তেমন কোনো জোর নেই।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই ভুবন দেখল মাথা তোলাটা নারকেলগাছে উঠে গেছে। টপাটপ নারকেল ফেলছে ওপর থেকে। নিচে দাঁড়িয়ে উল্লাসে চিৎকার করছে অন্য দুটো। এই গাছের নারকেলগুলো ঝুনা করে বাজারে বিক্রি করার ইচ্ছে ছিল ভুবনের।

উঠানের একপাশে মাটি কুপিয়ে একটা ছোট বাগান করেছিল গঙ্গা, সেই ছাত্র বয়সে। এখনো সে বাগানের যত্ন নেয়। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে দেখা গেল সেই বাগান তছনছ। নাকবোঁচা মেয়েটি পটাপট ফুলতো তুলছেই, গাছের ডালও ভাঙছে। ঠিক এইসময় গঙ্গাপদ সারারাত জাল বেয়ে বাড়িতে এলো। বাগানের অবস্থা দেখে সে চিৎকার করে উঠল, 'মা, ইয়ান কি?' বলতে বলতে সে বাগানে ঢুকে মেয়েটির গালে কষে একটা চড় লাগালো। বাগান নষ্ট করার ব্যাপারটি উর্বশীর চোখ এড়িয়ে গেল, কিন্তু চড় মারার দৃশ্যটি তার চোখ এড়ালো না। বিলাপের সুরে সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'অ গঙ্গা, তুই ইন কিইল্লি? দুধের মাইয়ারে এই রইম্যা চোয়ার মাল্লি? নো অইলে দুয়া উগ্‌গা ফুল ছিজ্যে। আজিয়া আঁর বাপ থাইলে তুই আঁর মাইয়ারে মারিত পাত্তিনি? হাইরে আঁর কোয়াল।'

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই উর্বশী সব বেমালুম ভুলে গেল। পাকঘরে ঢুকে ছেলেমেয়েদের পান্তাভাত খেতে দিল, নিজেও খেতে বসল। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত গঙ্গা খাবে কিনা—সেটা জিজ্ঞেস করার বা ভাবার কোনো প্রয়োজন সে বোধ করল না।

কয়েকদিন পর ঘরের কোনে ছেঁড়াকাঁথার নিচে নাইলন সুতার একটা বান্ডেল খুঁজে পেল গঙ্গা। এটা তো তাদের না! এটা এলো কোত্থেকে? নাকবোঁচা মেয়েটি বলল, 'আঁর বদ্দা চুরি গরি আইন্যে দে। ওই বাড়িত্তোন।' বলে সে ধনবাঁশিদের ঘরটি দেখিয়ে দিল।

গঙ্গা চোর-বদ্দার কান চেপে ধরলে সে বলে, 'আঁর বাপ জাল বুনিবারলাই আন্যিদে।'

ধনবাঁশিদের সঙ্গে গঙ্গাদের দা-কুমড়া সম্পর্ক। এই চুরির খবর জানতে পারলে লঙ্কাকাণ্ড হবে। তবুও সুতার এই বান্ডেলটি ফেরত দিতে হবে। ভুবন লজ্জার মাথা খেয়ে সেই সুতার বান্ডেলটি ধনবাঁশিদের বাড়িতে পৌঁছে দিল।

দিন দশেক পর উর্বশী বলল, 'অ ভইচ্, কালিয়া বেইন্যা যাইয়্যম গই।'

ভুবন নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'আইচ্ছা।'

রাতে ভাত খেতে বসে উর্বশী বলল, 'তোঁয়ার সুটকেশত দেইলাম দে বউত শাড়ি পড়ি রইয়্যে। তোঁয়ার তো এখন বিধবার বেশ। সাদা ধুতি পর। রঙিন কাওর পরন্যা কেউ নাই। তোঁয়ার শাড়িগিন আঁরে দি ফেলাও না।'

ভুবন কিছু বলল না। মুখটা শক্ত হয়ে উঠল তার।

পরদিন তিনটা শাড়ি দিল ভুবন উর্বশীকে। বন্ধ করার আগে উর্বশী অনেকটা ছোঁ মেরে দামি শাড়িটা তুলে নিল সুটকেশ থেকে। একটা বস্তায় পাঁচটা নারকেল,

আমারবই.কম

দুটো ভাতরাঁধার বড় সিলভারের পাতিল বেঁধে মাথাতোলার মাথায় তুলে দিল উর্বশী। দুটো হাঁস বেঁধে আরেক জনের হাতে ধরিয়ে দিল। উঠানে বসে নাকিসুরে বিলাপ করল কিছুক্ষণ। তারপর ভুবনকে নমস্কার করে রওয়ানা দিল কাট্টলির দিকে।

রামপদ অনেকটা নির্বাক হয়ে গেছে। খুব প্রয়োজন ছাড়া কথা বলছে না। বউ ও মায়ের নানা প্রশ্নের উত্তর হু বা না দিয়ে সারছে। একধরনের দুর্মর ভয় তাকে চেপে ধরেছে। সে তো মারাই গেছিল। ভাইটি তার দিকে রশি ছুঁড়ে না দিলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ-এ সে কোথায় ভেসে যেতো! সেদিন সকালে সে সমুদ্রে যেতে চায়নি। সারারাত ধরে ঝড়োহাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছিল। বউয়ের সান্নিধ্য তাকে ওম দিচ্ছিল। মনে মনে ঠিক করেছিল কোনো একটা ছুতা দেখিয়ে সে সমুদ্রে যাবে না। কিন্তু সকাল হতে না হতেই বাপটি হাঁকডাক শুরু করল। মাও ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে ডেকে যেতে লাগল। অন্য দুই ভাই ও গাউরটি যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল উঠানো। ভারে তামাক, পান্তাভাত, তরকারি, হুঁকো, পানির কলসি দেয়া হয়েছে। তারপরও রামপদ বার হচ্ছে না দেখে পূর্ণচন্দ্রের মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। জোরগলায় নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, 'হেই চোত্‌মারানির পোয়া বাইর অইব না নো অইব জিজ্ঞা। গোডা রাইত লাআনি লই ঘুম গেইয়ে দে নো অ? এই বুড়া বয়সত আই দইজ্যাত যাইয়্যম না জিজ্ঞা।'

কথাগুলো রামপদর কানে বিষ ঢেলে দিল। জড়িয়ে থাকা বউটিকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে বিছানা ছাড়ল সে। গজর গজর করতে করতে ভারটি কাঁধে নিয়ে সমুদ্রের দিকে রওয়ানা দিল।

সমুদ্রের রুক্ষ চেহারা রামপদকে আরও ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। এই সময় এলো ডাকাতরা। এত কষ্টের ফসল ডাকাতরা নিয়ে যাবে? বাপের সকালের ব্যবহার, সমুদ্রের একটানা নির্যাতন তাকে হঠাৎ করেই উত্তেজিত করে তুলল। নিরীহ রামপদ সেই উত্তেজনার বশে দাঁড় দিয়ে ডাকাতটির চোয়াল বরাবর আঘাতটি করেছিল। লোকটি ঘুরে পড়ে যাবার পর সেও ভড়কে গেছিল। জীবনে সে কাউকে এরকম মারেনি। আজ তার হাতে মার খেয়ে মানুষটি মারা গেল নাতো? এই ভাবনার মধ্যে প্রথম আঘাতটি এসে পড়েছিল তার কাঁধে। এরপর এলোপাথাড়ি কিল ঘুষি লাথিতে সে প্রায় অজ্ঞানই হয়ে যাচ্ছিল। এই সময় কে যেন তাকে ধাক্কা মেরে পানিতে ফেলে দিল। একটু পরে কানে ভেসে এলো, 'বদ্দারে, রশির মাথা কোঁরত বাঁধি ফেলাও।'

গত তিনদিন অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। পূর্ণচন্দ্র এই তিনদিন অন্য ছেলেদের নিয়ে সমুদ্রে গেছে। রামপদকে ঘাঁটায়নি। ছেলেটা একটু সুস্থির হোক। ভয়টা একটু কমুক। চতুর্থদিন রামপদকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'অ রামপদ, জালত যাচে না। আঁই এই বুড়া শরীল লইতো আর নো পারির।'

আমারবই.কম

রামপদ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, 'আঁই নো যাইয়্যম। কোনোদিন দইজ্যাত নো যাইয়্যম।'

পূর্ণচন্দ্র কিছু বলল না। ছেলের বিপর্যস্ত মন-মানসিকতার কথা বিবেচনা করে সেদিনও সমুদ্রে গেল পূর্ণ।

রামপদ দাওয়ার এককোনে জড়সড় হয়ে বসে আছে। দুপুরে মা বলল,'সিয়ান গরি আয় রামু, খাওনর সময় অইয়ে।'

রামপদ কোনো উত্তর দিল না। যেখানে বসা ছিল, সেখানেই বসে রইলো। আরও কিছুক্ষণ পরে বউ ভাত খেতে ডাকতে এসে দেখে রামপদ কী রকম কুঁজো হয়ে বসে আছে। হাঁটুর ভেতরে মাথাটা গুঁজানো।

বউটি বলল, 'উড না, ভাত খাইতা নো?'

'আঁই দইজ্যাত যাইতাম নো।' মাথাটা একটু তুলে বলল রামপদ। চোখ দুটো তার অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল। বউটি শাশুড়িকে ডেকে আনলো। দুই নারীতে ধরাধরি করে রামপদকে খাওয়ার ঘরে নিয়ে গেল। নীরবে খাওয়া শেষ করল সে। খাওয়া শেষে নিজের ঘরে চলে গেল।

বিকেলে পূর্ণ বহদ্দার ফিরে এলে তাকে সব খুলে বলল রামপদর মা। শুনে পূর্ণ বলল, 'হিতে বঅর বউ লউগ্গা। ডরানর দোয়াই দি সুযোগ লইত চাআদ্যে আরি। ঠিক অই যাইবো গই। বিয়ানিন ঠিক অই যাইবো গই।'

সবকিছু ঠিক হয়ে গেল না। রামপদ আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারল না। সে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেল। খাওয়ার কথা, স্নানের কথা, স্ত্রীর কথা কিছুই মনে রইলো না তার। শুধু মনে রইলো—সেদিনের তরঙ্গময় সমুদ্রের কথা, তাকে সমুদ্রে ফেলে দেয়ার কথা।

সমুদ্রে জেলেদের মাছ ধরতে যাওয়ার সময় রামপদ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, রাস্তার ওপর দাঁড়ায়। সমুদ্রে গমন-উদ্যত জেলেদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'দইজ্যাত নো যাইস্, দইজ্যাত নো যাইস্। পরিবি। পানিত ফেলাই দিব।'

গোটাদিন সে রাস্তায় রাস্তায়, পাড়ায় পাড়ায় হাঁটে। উসকুখুসকো চেহারা, লাল টকটকে চোখ। পেছন পেছন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সুর করে বলে, 'দউজ্যাত নো যাইস, পানিত ফেলাই দিব।'

রামপদ নির্বিকারভাবে হাঁটতে থাকে।

এগারো

গোলকবিহারী দুই ছেলেকে বিয়ে করিয়েছে। ধনবাঁশির বউটি রোগাটে। এর মধ্যে চারটি সন্তান প্রসব করে ফেলেছে। গলাটা অস্বাভাবিক লম্বা, সেই লম্বা গলার ওপর ছোট্ট মাথাটি বসানো। গোলাকার মুখ। ভাঙা ভাঙা কর্কশ কণ্ঠে অবিরাম কথা বলে সে। সন্তানদের প্রতি কোনো মায়ামমতা নেই। প্রতিরাতে স্বামীর

প্রয়োজন মেটাতে সে গলদঘর্ম হয়। পেট থেকে একটা সন্তান বেরিয়ে এলে অন্যটা উপস্থিত হয়। মেজাজ তার রুক্ষ।

মেজবউটির স্বভাব বড়বউটির বিপরীত। শান্ত, ধীরস্থির। ছোটোখাটো গড়নের এই বউটি কথা বলে কম, কিন্তু যা বলে তাতেই প্রতিপক্ষের আক্কেল গুড়ুম হয়। মেজবউয়ের বাপ অর্থশালী। ফলে তার আচার-ব্যবহারে দেমাগের ছোঁয়া আছে। সুযোগমতো সেটা প্রকাশ করতে সে দ্বিধা করে না। তার শরীর ঘন রসে টইটম্বুর। মেজছেলে কালাবাঁশি বউয়ের শরীর সম্পর্কে নিস্পৃহ। তার চিন্তায় শুধু নৌকা, জাল আর মাছ। অবসর সময়ে অন্যদের সঙ্গে এসব বিষয় নিয়েই কথা বলে সে। বউয়ের পাশে শুয়ে কালাবাঁশি নৌকা-জালের গল্প করতে শুরু করে। বউ যখন তার শরীর দেখাতে আগ্রহী, তখন কালাবাঁশি চোখ বন্ধ করে আগামীকাল জালে কী রকম মাছ পড়তে পারে, সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে ব্যস্ত। বউ বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শোয়।

আমারবই.কম

এক সময় কালাবাঁশির নাক ডাকে।

দুই বউয়ের মধ্যে সদ্ভাব আছে—তা বলা যাবে না। তবে কেউ কাউকে সহজে ঘাঁটায় না। মেজবউ সুরভিবালা বড়বউয়ের রূঢ় মেজাজের কথা জানে। আর বড়বউ ক্ষীরবালা মেজবউয়ের মিছরির ছুরির মতো কথাগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এছাড়া শ্বশুর গোলকবিহারীকে উভয়েই কম বেশি ভয় করে। তাই যৌথপরিবারের কাজগুলো উভয়ে ভাগ-বাটোয়ারা করে শেষ করে।

মধ্যরাতে জোআ ছিল। সুরভিবালা উঠে ভাত তরকারি, তামাক, পান ইত্যাদি গুছিয়ে দিয়েছে। গোলকবিহারী তার ছেলেদের সঙ্গে সমুদ্রে গেছে আজ। বাড়ি পুরুষশূন্য। ভোরসকালে উঠে বড়বউ ক্ষীরবালা পুকুরঘাটে গিয়ে বাসি বাসনকোসন, ডেক্সি-পাতিল মেজে ধুয়ে এনেছে। ঘরদোর ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। উঠানময় নানা ময়লা আবর্জনা, খড়কুটো ছড়িয়ে আছে। উঠানটা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা ঝাড়ু দিতে হয়। ঝাড়ু দেয় সাধারণত মেজবউ। মেজবউ নাইয়র গেলে ক্ষীরবালা উঠান ঝাড়ু দেয়। আজকে এতো বেলা হয়ে গেছে, তবুও সুরভিবালা ঘুম থেকে ওঠেনি। সকালের কাজের চাপে ক্ষীরবালা ক্লান্ত। সুরভিবালার ঘরের দিকে গলাটা উঁচিয়ে ক্ষীরবালা বলল, 'বেয়াগুনে ঘুম যার। আঁর কোয়াল্লান না হুদা খরাপ অইয়ে দে। এতাইন গরনর পরও এই বান্দিনীর কাম নো ফুরার।'

সুরভিবালা আধো ঘুম, আধো জাগরণে বিছানায় শুয়ে ছিল। ক্ষীরবালার সব কথা তার কানে যায়নি। শুধু বান্দিনী শব্দটা স্পষ্ট করে শুনলো সে। তার উদ্দেশেই শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে মনে করে সে তড়াক করে বিছানা থেকে উঠল। চোখ মুছতে মুছতে উঠানে এসে দাঁড়াল। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'অ বন্দি, বান্দি কন? তুঁই না আঁই? শব্দউয়া কইতে ইক্কিনি গলা নো কাঁপিল না?'

'তোরে কনে বান্দি ডাইক্যে? আঁই তো নিজেরে বান্দি কইদে।' দৃঢ়স্বরে বলল ক্ষীরবালা।

'শাক দি মাছ নো ঢাইক্যো। আঁই নিজের কানে হুইন্‌লাম। তুঁই আঁরে বান্দি ডাকিলা। আঁই বান্দির মাইয়াপোয়া নো? আঁর বাবে বহদ্দার। দুই-দশ গেরামর মাইন্‌ষে চিনে আঁর বাপেরে। কনে বান্দির মাইয়া হিসাব গরি চাও গই।' ক্ষীরবালার বাপের দারিদ্র্যের প্রতি ইঙ্গিত করে সুরভিবালা কথাগুলো বলল।

'তুই আঁরে এত তুড়িপাড়ি কথা কওদ্দে কিঅল্যাই। ছোড ছোড অই থাআবি। বেইন্যাত্তোন কাম গইত্তে গইত্তে আঁর বিষ মোরের। রাজরাণী বিছানত ভেডাই পড়ি রইয়্যে।' কর্কশকণ্ঠে বলল ক্ষীরবালা।

কণ্ঠ একটু উঁচুতে তুলে সুরভিবালা বলল, 'আঁই কাইত অই ফুইত্তম না চিৎ অই ফুইত্তম, হিয়ান কি কাত্তুন জিজ্ঞাই ফুতন পড়িবো নাকি? কন বেডির ভাত খাইর না? না আঁর জামাই নো কামার?'

ক্ষীরবালা নিজের রাগকে আর দমন করতে পারল না। তার স্বভাবসুলভ খ্যানখ্যানে গলায় বলে উঠল, 'অ ভাইশ্যালাইন, হতিনর ঝিঅর কথাগিন কি রইম্যা হুইনতা লাইগ্যা না? আইঅ কি কার লাঙঅর ভাত খাইর না? আঁর নেগে হাত-দইজ্যা হেঁচি কামাই আনের দেই খাইদ্যে।'

'তোর বাপে তোরে চুইদ্যো। তুই কারে হতিন ডাকর দে। আইউক আজিয়া তোর লাঙ কালাবাইশ্যা। একজনর চনুদি তোর বিষ নো মরের। আঁর জামাইর চনুঅ তোর হেঁডাত ঘল্লাই দিতাম কইয়্যাম।' কথাগুলো ধীরে ধীরে টেনে টেনে বলল সুরভিবালা।

এরপর উভয়ের মধ্যে শ্রাব্য-অশ্রাব্য ভাষায় আরও অনেকক্ষণ ঝগড়া হল। শাশুড়ি সুধারাণী আপ্রাণ চেষ্টা করল দুই বউকে থামাতে। কিন্তু বড়বউ এক ঝামটায় তাকে থামিয়ে দিল। অসহায় দৃষ্টি দিয়ে দুই বউয়ের ঝগড়া দেখে গেল সুধারাণী। তাদের চিৎকার চেঁচামেচিতে আশপাশের বাড়ি থেকে দু'চারজন মহিলা এসে উপস্থিত হল। তারা মধ্যস্থতা না করলে এই ঝগড়া চুলাচুলিতে গিয়ে পৌঁছাতো।

সেদিন ধনবাঁশি ও কালাবাঁশির মধ্যে মারপিট হয়ে গেল। বেশ ফুর্তি নিয়ে দু'ভাই সমুদ্র থেকে ঘরে ফিরেছিল। আজ মাছ কম পড়লেও ভাল দাম পাওয়া গেছে। গোলকবিহারী টাকাগুলো কোঁচড়ে বাঁধতে বাঁধতে বলেছিল, 'তোরা দুই ভাই আগাই যা। আঁই, ধর্মচরইন্যা আর হারাধইন্যা নৌকা গোছগাছ গরি ইক্কিনি পরে আইর।'

উঠানে পা দিতে না দিতেই বড়বউ চিৎকার করে উঠল, 'আঁই বলে হতিনর ঝি, কালাবাইশ্যারে দি আঁর বলে বিষ মারাইবো। হিতার চনু বলে আর হেঁডাত ঘল্লাই দিব। ইয়ানর বিচার গরি ঘরত ঘল্লইবা। নো অইলে আঁর মোরা মুখ দেখিবা।'

ওইদিকে সুরভি চাপাস্বরে বলছে, 'আঁই বলে বান্দির মাইয়াপোয়া। আঁই বলে পিতিনি মাইনষর ঝি। আঁই বলে ফুতিফুতি ভাইরর কামাই খাই। আঁই এই কথার বিচার চাই।'

বউদের এই উত্তেজক সংলাপে দুই ভাই প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ল বিতর্কে। সেই বিতর্ক প্রথমে গালিগালাজ, তারপরে মারামারিতে রূপান্তরিত হল। গোলকবিহারী ও ছোটছেলে ধর্মচরণ এসে দেখল—ধনবাঁশি কালাবাঁশির মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

পরদিন সকালে বউকে নিয়ে গ্রাম ছাড়ল কালাবাঁশি। গোলকবিহারী অনেক বুঝালো তাকে। মা সামনে হত্যে দিয়ে পড়ল। ছোটভাই বলল, 'বদ্দা, আঁরার সোনার সংসারগিন নো ভাইঙ্গো। তোঁয়ার পাআত পড়ি। তুঁই আঁরারে ছাড়ি নো যাইও।'

সুরভিবালা বলল, 'আঁর বাপে তোঁয়ারে সোনার খাডত ফুতাই রাইবো।'

কালাবাঁশি সস্ত্রীক গ্রাম ছাড়ল।

আমারবই.কম

দীনদয়াল পড়ুয়াদের রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষা থেকে মাছের নামগুলো শিখে আসতে বলেছিল। পড়াতে পড়াতে বলেছিল, 'তোঁরা হইলা যেন জাইল্যার হোয়া, মাছের লগে তোঁয়ারার কাজ-কারবার। হিয়েল্যাই মাছর নামগুন তোঁরারক্তুন বালা গরি শিখন দরকার। এক্কেবারে কণ্ঠস্থ গরি আইবা। কও, আঁর লগে লগে কও—'রোহিত মাগুর পাবদা তপসী চিতল।'

সমবেত ছাত্রছাত্রীরা তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছে—

ভেউস বাউস কই জিওল কাতল,
ইলিশা খলিশা বাইম গোলসা কোড়াল,
চাঁদা বাচা চিংড়ি চেলা বাতাসি বোয়াল।

আজ সবাই পড়া শিখে এলেও রামনারায়ণ বহদ্দারের ছেলে গুরুপদ পড়া শিখে আসেনি। পড়া না শিখার কারণ সে কাঁইকুঁই করে বলতে চাইছিল। কিন্তু দীনদয়াল তার কথায় কর্ণপাত করেনি। চিকন বেত দিয়ে বেদম পিটিয়েছে সে ছেলেটিকে। বেতের আঘাতে পিঠের দু'এক জায়গায় কেটে গেছে। রক্তও গড়াচ্ছে সেখান থেকে। অন্যান্য পড়ুয়ারা সন্ত্রস্ত হয়ে শিক্ষকের এই রুদ্র মূর্তি দেখল। দীনদয়ালের এই মূর্তি তারা এর আগে দেখেনি। শান্ত, ধৈর্যশীল মানুষটি আজ দানব হয়ে উঠেছে।

গত রাতটা বড় কষ্টে কেটেছে দীনদয়ালের। পারতপক্ষে অশিক্ষিত বউটাকে এড়িয়ে চলে সে। কিন্তু গতরাতে পাশে শুয়ে চরণদাসী ঘ্যানর ঘ্যানর করছিল, 'এই রকম হড়াই হড়াই চইলব নি? কউগা টিয়া কামাই অয় এতে। তুঁই জাইল্যার হোয়া। তোঁয়ার বাপ আছে। মাইনষ্তোন ধার কজ্জ করি না-জাল গর। সংসারত সুখ আইসবো।'

'ছাই মাখি তোঁয়ার হেই সুখর মুখত। হোয়া পড়াই আঁই যেই সন্মান পাই, বহন্দার অই হিয়ান হামু নি?' রাগতস্বরে বলল দীনদয়াল।

'সন্মান ধুই ধুই হানি খাইয়্যম নি। টিয়া হইসা নো থাইলে কার কি দাম?' বউটি খেঁকিয়ে উঠল।

দীনদয়ালের মাথা গরম হয়ে গেল। বিছানায় উঠে বসে বলল, 'অশিক্ষিত মাইয়ার লগে কী কথা? সন্মানের দাম তুঁই কি বুইঝবা। খাই খাই ধুমচি হইচ। খাইদ্য আর টিয়া ছাড়া আর কী বুঝ?'

চরণদাসী কর্কশকণ্ঠে বলল, 'মোডা কি আঁই নিজে হইচি নি? মোডা বানাইছে ভগমানে। তোঁয়ার চালচলন আঁই কি বুঝিয়ের নানি? তুঁই গাছর কোন আগাত হাঁডো ইয়ান কি আঁই টের হাইয়ের নানি?'

পাশের ঘরে বাপ-মা ঘুমাচ্ছে। এতরাতে এই ধরনের কথা কাটাকাটি তাদের কানে গেলে লজ্জার আর সীমা থাকবে না। দীনদয়াল চুপ মেরে গেল। বউ আরও কিছুক্ষণ আঁতে ঘা-লাগা কথা বলে গেল। একসময় সে নাক ডাকতে শুরু করল। দীনদয়াল নির্ঘুম রাত কাটাল।

সকালে ছাত্র পড়াতে বসে দীনদয়ালের এই বিপর্যয়। রামনারায়ণের ছেলেটাকে মারতে মারতে তার হঠাৎ মনে হয়েছিল, সে ছাত্র পিটাচ্ছে না, দুর্মুখ বউটাকে পিটাচ্ছে। মঙ্গলীর ডাকটা আর কানে না পৌঁছালে সে হয়তো ছেলেটাকে মেরেই ফেলতো। তার এই ভয়ংকর মূর্তি দেখে সবদিনের মতো বসে-থাকা মঙ্গলী বলে উঠেছিল, 'অ ছেয়ার, কীত্তা লাইগ্য। পোয়াউয়া তো মরি যাইবো গই।'

মঙ্গলীর কথায় দীনদয়ালের সম্বিৎ ফিরে এলো। লজ্জিতও হলো। মুখ কাঁচুমাচু করে মঙ্গলীর উদ্দেশে বলল, 'মাথাটা ঠিক আছিল না। গত রাইতে—' বলতে বলতে সে ঢোক গিলল। দুঃখের কথা অতি কষ্টে পেটে চালান করে দিল দীনদয়াল।

ছেলের এই রকম নির্যাতিত চেহারা দেখে রামনারায়ণের বউটি বেশ অবাক হল। এতদিন পড়াচ্ছে দয়াল মাস্টার, কোনো ছাত্রকে এরকম পিটিয়েছে বলে শোনেনি। আজ নিশ্চয় মাস্টারের মন ভাল ছিল না। হয়তো বউটি জ্বালিয়েছে তাকে। মা-বাবা কেউ অপমানজনক কথা বলেছে। ছেলের পিঠে কেরোসিন তেল মাখতে মাখতে এসব কথা ভাবছিল বউটি। কিন্তু রেগে গেল রামনারায়ণ। সমুদ্র থেকে ফিরে ছেলের হতমান চেহারা দেখে ভীষণ ক্ষেপে গেল সে। 'কী চেঁডর মাস্টর'—চাপাস্বরে গর্জন করে উঠল সে।

বউ হাত চেপে ধরে কাতর কণ্ঠে বলল, ' তুঁই এ-ন নো গইজ্যো। আঁরার পোয়া মানুষ গরের তাঁই। কোনো কারণে মাথা গরম আছিল। পোয়ার উঅদ্দি ঝাইজ্যে।'

বউয়ের কথায় চুপ মেরে গেল রামনারায়ণ। কিন্তু ক্ষোভটা ভেতরে ভেতরে গজরাতে লাগল।

ভাদ্রমাস শেষ হয়ে এল। ইলিশের মরসুম শেষ। এবার লইট্যামাছের বিহিন্দিজাল বসাবে জেলেরা। দিন এনে দিন খাওয়ার সময় শুরু হবে তাদের। দাদনকারীরা ইলিশের মরসুমকেই লক্ষ্য করে টাকা লাগায়। লইট্যার মরসুমের প্রতি তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। ইলিশের মরসুমকে ঘিরেই তাদের শোষণ-প্রক্রিয়া সচল থাকে। ইলিশ-মরসুম শেষে তারা জেলেদের হিসেব দিতে বসে। সে-হিসেবে থাকে প্রচুর গোঁজামিল। মরসুমের সময় সব জোআর টাকা তারা পরিশোধ করে না। বলে, লিখে রাখছি। মরসুম শেষে হিসেব হবে। জেলেরা তাদের কথায় আস্থা রাখে। তারাও একটা হিসেব রাখে, তবে মনে মনে। মরসুম শেষে সেই হিসেবের সঙ্গে দাদনদারদের হিসেবের বিরাট ফারাক হয়। দাদনদাররা বলে, 'মনে মনে হিসাবর কোনো দাম আছে না? এই চাও খাতাত লেখি রাখ্যি? তোঁরা এত টিঁয়া বেশি কও কেএনে?' গোঁজামিল দেয়া হিসেবের খাতাটা এগিয়ে দিতে দিতে বলে তারা। জেলেরা চুপ মেরে যায়। ভাবে—দাদনকারীদের কথাই ঠিক। অশিক্ষিত মানুষ, হয়তো হিসেবে ভুল করেছে।

এবারও রফিকের চায়ের দোকানে হিসাব নিয়ে বসেছে শুক্কুর ও শশিভূষণ মহাজন। ঋণ গ্রহণকারী জেলেরাও তাদের সামনে টুলের ওপর বসে আছে। তাদের চোখে মুখে চাপা আনন্দ। এবার প্রচুর মাছ দিয়েছে তারা। এবার আর ঋণ থাকবে না। উপরন্তু, কিছু টাকা দাদনকারীদের কাছ থেকে পেতেও পারে।

শশিভূষণ মহিম পাউন্যা নাইয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মইমা, তুই লইলি যে আঁত্তুন তিন হাজার টিঁয়া। মাছ দিয়চ যে দুই হাজার সাতশ পঞ্চাইশ টিঁয়ার। আঁই আরও তোত্তোন দুইশ পঞ্চাইশ টিঁয়া পাইয়্যাম।'

'মাছ তো কেএন আঁই আরও বেশি টিঁয়ার দি পাআন্‌লার।' মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল মহিম।

'আঁই কি মিছা কথা কইযে না? তোরার মত গরিব মাইনষর টিঁয়া খাইয়েরে আঁর কী লাভ? নরকের ডর নাই?' চোখ দুটো কুঁচকে চুলবিরল মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল শশিভূষণ। মনে মনে ভাবল—'জাইল্যার পোয়া ইবারে ঠাণ্ডা গরি নো দিলে পরেরগুনে হৈ-হল্লা গরিবো।'

মুখে মধু ঢেলে শশিভূষণ সবার উদ্দেশে বলতে লাগল, 'তোঁয়ারা হইয়ো যে আঁরার আত্মার আত্মীয়। জাত আলাদা হইলে কি অইবো। বিয়ানে উডিবার সময় একজন আরেক জনর মুখ দেখি। হেই মাইন্‌ষেরে ফাঁকি দিলে ঈশ্বর মাফ নো গরিবো। তোঁয়ারা আঁরার উঅদ্দি বিশ্বাস রাখ। তোঁয়ারারে আঁরা কনোদিন ঠগাইতাম নো।'

তার এই বক্তৃতায় কাজ হল। অন্যান্য ঋণ গ্রহীতারা চুপ্‌সে গেল। যার যার পাওনাগণ্ডা শশিভূষণের কাছ থেকে বিনা প্রতিবাদে বুঝে নিল।

কিন্তু গোলমালটা লাগল কামিনীর সঙ্গে শুক্কুরের। সেও শশিভূষণের মতো মুখে সৌম্যভাব ছড়িয়ে হিসেবের খাতাটা খুলল। সে খাতার হিসেবে প্রচুর গড়মিল।

সে কামিনীর উদ্দেশে বলল, 'বহদ্দার, তোঁয়ার ঋণ আর মাছর দাম সমান সমান। আঁই তোঁয়াত্তোন কোনো টিয়া পাইতাম নো, তুঁইও আঁত্তোন কোনো টিয়া নো পাইবা।'

'পাইয়্যম, টিয়া পাইয়্যম আঁই তোঁয়াত্তোন।' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কামিনী। 'তোঁয়ার হিসাবত গণ্ডগোল আছে।'

'আঁই ভুল কইত পারি, আঁর খাতা কি মিছা কথা কইবো না?' বলতে বলতে শুক্কুর মিয়া খাতাটি এগিয়ে দিল কামিনীর দিকে।

জামার ভেতর থেকে একটা দুমড়ানো খাতা বের করতে করতে কামিনী বলল, 'আঁই যেদিন যেদিন মাছ দি, হেই মাছর দাম দয়াল মাস্টররে দি এই খাতাত লেখাই রাখ্যি। এই খাতার হিসাবে আঁই তোঁয়াত্তোন আরও দেড় হাজার টিয়া পাইয়্যম।'

'হেই খাতার যোগত ভুল আছে।' শুক্কুর উচ্চকণ্ঠে বলল।

'ভুল নাই। আঁইও হিসাব গরি চাই। তোঁয়াত্তোন আরও এক হাজার পাঁচশ টিয়া পাইবো।' দোকানের বাইরে দাঁড়ানো গঙ্গাপদ বলে উঠল।

দয়াল মাস্টারও বলল, 'আঁর হিসাবত ভুল নাই। ভুল অইত নো হারে।'

'তোরা কন্, তোরা কন্‌রে?' চোখ রাঙিয়ে চিৎকার করে উঠল শুক্কুর।

গঙ্গা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আঁরার পরিচয় পরে লইও। আগে নিজের হিসাব দও। বহুত দিন চইবই খাইও। এখন হদর কথা কও।'

শুক্কুর কটমট করে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকল। মুখে কিছু বলল না। মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল হিংস্র ভাব।

দুটি খাতা পরীক্ষার পর দেখা গেল, কামিনীর খাতাই ঠিক। শুক্কুর তার খাতায় টাকার সংখ্যা ঠিকই লিখেছে। কিন্তু যোগফল লিখে রেখেছে কম। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও সে ভেবেছিল মিথ্যে হিসেব দিয়ে পার পেয়ে যাবে। কামিনী তাকে আটকে দিল। গঙ্গার সাহসী পদক্ষেপে শুক্কুরের সমূহক্ষতি হয়ে গেল। উপস্থিত জেলেরা বুঝে গেল যে, এতদিন এই সব দাদনদাররা তাদের কী ক্ষতি করেছে। গঙ্গা তাদের চোখ খুলে দিল।

যার যার হিসেবপত্র বুঝে নিয়ে সবাই উঠে গেল। গুম মেরে বসে থাকল শুক্কুর। ভেতরে দাউ দাউ আগুন। মুখে উচ্চারণ করল, 'বেবসা-ছাড়ি দওন পড়িবো। খানকির পোয়া গঙ্গাইয়ার লিডারগিরি থামাই দেওন পড়িবো।'

অনেক পরিশ্রমের বিনিময়ে, অনেক স্বপ্নের কারুকাজে সংসারটা সাজাতে চেয়েছিল গোলকবিহারী। ছেলেগুলোকে মানুষ করেছিল। ছেলেরা যত বড় হয়েছে, তার

স্বপ্নসাধও তত বড় হয়েছে। ছেলেরা আয়সক্ষম হয়ে উঠল, বহদ্দার হবার ইচ্ছেটাও পূরণ হল। সন্তানদের ভালর জন্যে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে সে সংকীর্ণ জায়গায় বসবাসের নাগপাশ থেকে মুক্তিও নিয়েছিল। কিন্তু আজ সব শেষ। ছয় মাস শেষ হয়ে গেছে অনেক আগে। ভুবনদের ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হবে সেই সংকীর্ণ ভিটেটিতে। তাও তো সুখের। এ বছর যা কামাই হয়েছে, তা দিয়ে দু'এক গণ্ডা জায়গা কেনা যেতো, কিন্তু কিনবে কাদের জন্যে? যে-সন্তান এক সময় তার কথায় উঠতো বসতো, আজ সে-সন্তান বউয়ের হাত ধরে শ্বশুরবাড়িতে চলে গেল। বাপের দিকে তাকাল না। মায়ের অনুরোধ রাখল না। ভাইয়ের কাকুতিকে মাড়িয়ে চলে গেল। উঠানে স্তূপ করে রাখা বিহিন্দিজালে ঠেস দিয়ে বসে এসব ভাবছিল গোলকবিহারী।

'তুঁই কি ভাইবতা লাইগ্যো? যা হওনর অই গেইয়ে গই। মরাপোয়া লই কাঁদি লাভ নাই।' গোলকের মনের কথাগুলো ধরতে পেরেই বলল সুধারাণী।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোলক বলল, 'তুই কেএনে বুঝিলি?'

'তোঁয়ার লগে আজিয়া দুই কুড়ি বছর ঘর গরির। তোঁয়ার মনর কথা বুইঝতে আঁর কি ভুল অইবো না?'

'সংসারগান কি রইম্যা ভাঙি গেল গই।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল গোলক।

'তোঁয়ারে কনে কমর সংসার ভাইঙ্গে। একজন গেইয়ে যাউগ, বউঅর ঠেঙ ধুই ধুই পানি খাউক। কালাবাইশ্যা ছাড়া আঁরার তো বাঘর মত আরও দুআ পোয়া আছে। হিতারার মিক্কে চাও। মনের দুঃখ কমিবো।' নিজের মুখটা আঁচল দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে বলল সুধারাণী।

'হিতারাও দে আঁরার মাথাত মুতি নো দি যাইবো গই, তার কোনো গেরান্টি আছে নি?' সরোষে বলল গোলক।

'যেঁত্তের কথা হেঁএত্তে দেখা যাইব। তুঁই ইক্কিনি উড ত, এদ্দুর দুইজ্যা অই গেইয়ে গই। সিয়ান গরি আহয়ো। ভাত খাওনর সময় অহএ।' সুধারানী স্বামীকে তাগাদা দেয়।

দিন দশেক পরে শুক্রবারদিন গোলকবিহারী ভুবনদের ভিটেয় তোলা ঘরটি ভেঙে ফেলল। সপরিবারে চলে গেল নিজের পুরনো সংকীর্ণ আস্তানায়।

আজ বড় আনন্দের দিন ভুবনের। জগদ্দল পাথরটা বুক থেকে সরে যাচ্ছে। প্রায় একবছর গোলকবিহারী তাদের জায়গাটা দখল করে ছিল। প্রতিটি মুহূর্ত ভুবন শঙ্কায় কাটিয়েছে। কখন কোন বিপদ ঘটায় ধনবাঁশির বাপ। গঙ্গাকে কাকতালীয়ভাবে কুকুরে কামড়িয়েছে, তা বিশ্বাস করে না ভুবন। কিন্তু সন্দেহের কথাটি সে কাউকে বলেনি কোনোদিন। আরও বড় বিপদের আশঙ্কা করছিল সে। কিন্তু আজ গোলবিহারী ঘরটা ভাঙা শুরু করলে ভুবন আবেগটা আর ভেতরে চেপে

রাখতে পারল না। গঙ্গাকে কাছে ডেকে বলল, 'গঙ্গাপদ, আজিয়া শুক্কুরবার, কালিয়া শনিবার। কালিয়া শনিবা'জির পূজা দিয়্যম। আঁই উয়াস থাইক্যম। তুই থাআবি না?'

'কালিয়া আঁই পূর্ণ বহদ্দারর জালত যাইয়্যম। উট্টাইল্যা গাউর। এক জোআ কুড়ি টিয়া দিব। খাওনর মাছও দিব। তুঁই থাইক্য মা।' বলল গঙ্গা।

'আইচ্ছা। বিয়ানে আঁই বাওনরে কই রাইখ্যম। বাজারত্তোন ফলমূল, সাগুচিনি কিনি আইন্যম।'

'আইছা মা, হঠাৎ গরি শনিপূজা কা দিতা লাইগ্য?' জিজ্ঞাসা করল গঙ্গাপদ।

'অ পুত, তুই নো জানস্ আঁরার কত বড় ফাড়া কাইট্যে। ধনবাইশ্যার বাপ আঁরার ভিঁডা দখল গজ্যিল, সদ্দার অলে ছ'মাসের সময় দিলেও লড়নর নাম নিশানা নো আছিল, কালাবাইশ্যা বেইমানী গরনে মন ভাঙি গেইয়ে গই ধনবাইশ্যার বাওর। আজিয়া ভিঁডাত্তোন যার গই। শনিবা'জি বড় ফাড়াত্তোন বাঁচার। হেতল্যাই শনিপূজা দিতাম চাইদ্দে।' কথাগুলো একনাগাড়ে বলে একটু দম নিল ভুবন।

গঙ্গা বলল, 'তুঁই যেএনে খুশি হও মা।'

পরদিন সন্ধ্যায় শনিপূজার সিন্নি খেতে এলো বংশীর মা, গুড়াবি, অনন্তবালারা। জয়ন্তও এলো তার কানা বউটিকে নিয়ে। আশপাশ থেকে অনেক গুড়াগুর্বা এলো হাতে গ্লাস, ছোট জগ, বাটি নিয়ে। পূজা শেষে সিন্নি বিতরণ করল জয়ন্ত, তাকে সাহায্য করল গঙ্গা। গোটাদিনের উপোসে ভুবনের মুখে ক্লান্তির ছাপ। তবুও স্বস্তির একটা উদ্‌ভাসন লক্ষ করা গেল তার চোখেমুখে। ব্রাহ্মণ চিত্তরঞ্জন শর্মা দক্ষিণা ও পূজার উপাদেয় অংশ গামছায় বেঁধে বিদায় নিলেন।

সিন্নি খেতে খেতে বংশীর মা বলল, 'অ গঙ্গার মা, এইবার পোয়ারে বিয়া গরাও।'

বংশীর মায়ের আচমকা এই কথায় ভুবন ফিরে তাকাল। মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এখন কি বিয়া। পোয়া ত আইজো ছোড। মাত্র এক কুড়ি দুই বছর চলের।'

'ইবাইতো বিয়ার বয়স। হারাজীবন কষ্ট গইল্যা। মাছ বেচি আই রান্না, রান্না গরি মাছ বেইচ্‌তা গেলা। বউ আইলে রান্নার কষ্টত্তোন বাঁচিবা।' বংশীর মায়ের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে গুড়াবি কথাগুলো বলল।

ভুবন আর প্রতিবাদ করল না। ভাবল, এই বয়সেই তো জেলেসমাজে পুরুষদের বিয়ে হয়। তবে তার ছেলে বাদ যাবে কেন? মা হিসেবে তারও তো একটা দায়িত্ব আছে। গুড়াবির কথায় ভুবন বলল, ' চাই, কী গরন যা।'

বিয়ের প্রথমদিকে স্বামী জিনিসটি যে কি তা ভুবন বোঝেনি। তখন সে নিতান্ত বালিকা। একটু বয়স হলে পর বুঝেছে—স্বামীটি তার বৈষয়িক নয়, কিন্তু

বেরসিকও নয়। চন্দ্রমণি যতটুকু বাস্তববাদী, তারচেয়ে বেশি কল্পনাপ্রবণ, রসিক। বেশিরভাগ নারী যে-ধরনের বৈষয়িক স্বামী চায়, চন্দ্রমণি সেরকম ছিল না। একটা সময়ে উচ্ছল চন্দ্রমণি তার মনে জায়গা করে নিতে পেরেছিল। একে অন্যের শরীরের সান্নিধ্যলাভের পর উভয়ের মানসিক দূরত্ব ঘুচে গিয়েছিল। নিত্যদিনের অভ্যাসে জড়িয়ে থেকে, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা যত্ন করে, রান্নাবান্না, স্বামীর দেখাশোনা, পরিবারের সকলের অসুখ-বিসুখ, মৃত্যু, ছেলের পড়াশোনা—এসব নিয়ে জীবনের চল্লিশটি বছর কাটিয়ে দিল ভুবন। ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, কলুষতা এইসব নিয়ে পুঁতিগন্ধময় যে জেলেসমাজ, তার মধ্যেই জীবনটাকে এতদূর টেনে এনেছে সে। এই সমাজ তাকে কমও দেয়নি। সমাজের মানুষগুলো যদি বিপদে তার পাশে এসে না দাঁড়াতো, তাহলে তার জায়গাটি বেহাত হয়ে যেতো। বংশীর মায়ের মতো নারী যদি তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দিতো, তাহলে আজ সে কোথায় ভেসে যেতো কে জানে?

এই সেদিনের ছেলে গঙ্গা, তার সামনেই বড় হয়ে উঠল। বড় ক্ষীণকায় ছিল সে। প্রসবের পর ধাত্রী তার পাশে ছেলে নামের একটি ছোট্ট মাংসপিণ্ডই রেখেছিল। মানুষের এত ক্ষুদ্র শরীর হয়! ওইটুকু বাচ্চাটি ধীরে ধীরে বড় হল। অন্য আর দশটা জেলেছেলের মতো সুঠাম দেহী নয় সে। মাঝারি সাইজের একহারা গড়ন। গঙ্গা বাপের মুখের আদলটা পেয়েছে, শরীরটা পায়নি। চন্দ্রমণি ছিল দীর্ঘদেহি, গঙ্গা চন্দ্রমণির মত বেড়ে ওঠেনি। মায়ের ধবধবে ফর্সা রঙটি তার গায়ে, চোখ দুটো বাপের মতোই। বিড়ালাক্ষি গঙ্গার মধ্যে চন্দ্রমণির অস্তিত্ব অনুভব করে ভুবন।

আজ এতদিন পরে এত কথা ভাবতে বসেছে কেন ভুবন? বংশীর মায়ের কথায়? বংশীর মা গঙ্গাকে বিয়ে করাতে বলেছে। এই বিয়ের মধ্যদিয়ে চন্দ্রমণির অস্তিত্বের বিস্তার ঘটবে বলেই কি সে আজ বংশীর মায়ের কথায় এত নিবিড় শিহরণ অনুভব করছে?

বারো

প্রায় দুপুর। বউটি ঘরে নেই। মাছ বেচতে গেছে। দাওয়ায় বসে আছে জয়ন্ত। সামনে ঢোল। তাতে মৃদু লয়ে দুহাতের আঙুল সক্রিয়। গুনগুন করে কী যেন গাইছে সে। গানের কথাগুলো স্পষ্ট নয়। একটা সময়ে তার গলা দিয়ে গানের কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে এল। সে গলা ছেড়ে গাইতে লাগল—

বিচ্ছেদের সাগরে আর কতকাল ভাসিব,
কোথা গেলে শ্যামের দেখা পাব।
কথা বুঝাতে দরদি নাই, কারে বা বুঝাব।

হতাশার জোয়ার ভাটায়, সদা আমি ভেসে বেড়াই,
কূল কিনারা বুঝি নাহি পাব।
কোথা যাই বা কোথা থাকি, কিসে আমি জীবন রাখি,
এইবার আমি নিশ্চয়ই মরিব।

চোখ দুটো বন্ধ করে গান গাইছিল জয়ন্ত। কখন গঙ্গা এসে দাওয়ায় তার পাশে বসেছে টের পায়নি। গানটা গাওয়া শেষ হলে গঙ্গা জিজ্ঞেস করে, 'অ জয়ন্তদা, তুঁই এই রইম্যা কষ্টর গান কা গাও সবসময়? '

জয়ন্ত চোখ মেলে তাকাল। এক নিবিড় উদাসীনতা তার চোখে। অনেকক্ষণ গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। যেন গঙ্গার কথা সে শুনতে পায়নি। গঙ্গাও জিজ্ঞাসু চোখে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে থাকল। একসময় জয়ন্ত বলতে শুরু করল, 'বুঝিলি নি গঙ্গা, একদিন আঁরও উদ্যানতও বিজন বহন্দারর মত জাল, গাউর, বিয়ারি কিলবিল গইত্তো, আর বাপর নাম আছিল জয়সিন্ধু। জয়সিন্ধু বহন্দার বলি বাইশ গেরামর মানুষে চিনতো। আঁর কোয়ালত সুখ নাই। গুড়া বয়সত আঁর বাপ মারা গেল। মাইনষে ক যক্ষ্মা অইল বলে।'

গঙ্গা হা-করে তার কথা শুনছিল। জয়ন্ত একটু থামলে গঙ্গা বলে উঠল, 'মা, মা তো আছিল?'

'বছর খানেকের মধ্যে মাও মরি গেল। সংসার চালাইতো যাই মা এই এক বছরে নৌকা-জাল বিয়াগ্নিন বেচি দিএ। তারপর এই ঘাঁডত্তোন ওই ঘাঁডত। মানুষের লাথি-পিছা খাই বড় অইলাম। আইজ্যা-পাইজ্যা অল মিলি বিয়া গরাইল। তোর বদিউয়া বঅর ভালা মাইয়াপোয়া আছিল। কিন্তু হেই সুখও আঁর কোয়ালত নো সইল। পোয়া বিয়াইতো যাই মরি গেল গই'—বলে চুপ মেরে গেল জয়ন্ত।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে গঙ্গা বলল, 'তারপর?'

'তারপর আর কী? তারপর এই কানাবউ আইয়েরে জুঠিল। মাইনষে কইলো, আবার সংসার গর জয়ন্ত। হাঙ্গা গইল্যাম। কিন্তু সংসারত মন নো বইয়ে। মাঝেমইধ্যে কইল্‌জা মোচড় দি উডে। তখন গান গাই। বিচ্ছেদের গান, কষ্টর গান'—বলল জয়ন্ত।

জয়ন্তর কানাবউটা ঘরে ঢুকল। মুখে তার অনেক ক্লান্তির ছাপ।

গঙ্গা বলল, 'বউদি আইস্যে। আঁই যাই জয়ন্তদা।'

জয়ন্ত উঠে গেল বউয়ের পাশে। খাড়াং থেকে চাল, আলু, বরবটি, মিষ্টি কুমড়ার টুকরো, লবণের পুঁটলি—এসব নামাল; খাড়াং, পাল্লা,তক্তা সযত্নে তুলে রাখল যথাস্থানে।

বউ আঁচলে ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'এগিন কী গইত্যা লাইগ্য তুঁই। ইয়ান মাইয়াপোয়ার কাম। মাইনষে দেইলে শরম দিব।'

'রাখো তোঁয়ার শরম। বউ যখন জামাইর লুঙ্গি-ধুতি-গেঞ্জি-জামা ধুই দে, তখন বউয়েরে শরম নো দে কেউ?'

বউটি অবাক হয়ে বলল, 'ওমা, শরম কা দিত? জামাইর কাম বউয়ে নো গরিবো না?'

'জামাইর কাম বউয়ে গইল্যে যদি শরম নো লাগে, তইলে বউঅর কাম জামাইয়ে গইল্যে শরমের কি আছে?' বলল জয়ন্ত।

জয়ন্তর বউটি জানে স্বামী তাকে পছন্দ করে। কারণে অকারণে সাহায্য করে। রান্নাঘরে বসে এটা ওটা এগিয়ে দেয় তার দিকে। তারপরও জয়ন্তকে বুঝে উঠতে পারে না বউটি। হাসতে হাসতেই একসময় গম্ভীর হয়ে যায় সে। তখন দূরে, বহুদূরে যেন কি খুঁজে বেড়ায়। বউয়ের অস্তিত্ব তখন তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়।

সন্ধ্যে উতরে গেছে অনেক আগে। কার্তিক মাস। এধারে ওধারে হালকা কুয়াশার আস্তরণ। জেলেবাড়িগুলোর আশপাশে ঘন কুয়াশা। রান্নার ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে কুয়াশা এই ঘনত্ব পেয়েছে। উঠানের কোনায় কোনায় ঝোপঝাড়ে জোনাকিরা আলো ছড়াচ্ছে।

আজ বংশীদের ঘরে পাড়ার মুখ্য গৌণ ব্যক্তিরা এসেছে। ঘরের মধ্যে পাটি বিছিয়ে তাদের বসতে দেয়া হয়েছে। একটি কাঁসার থালায় পান-সুপারি-চুন-খয়ের-বিড়ি দেয়া হয়েছে। দু'চারজন অলসভাবে পান চিবুচ্ছে।

কোনো বিচারের জন্যে আজকের এই জমায়েত নয়। এটা পানছল্লার আসর। বংশীকে বিয়ে করানো হবে আগামী মাসে। সমাজের অনুমতির দরকার। অনুমতি নেয়ার এই সভাকে পানছল্লা বলে। যুবরাজ বিড়ির একটি বান্ডেল পূর্ণ বহদ্দারের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'অ বংশীর বাপ, কিঅল্যাই সর্দার-মুখ্য অলেরে ডাইক্যো? সভাত আইয়েরে কও।'

বংশীর বাপ ভোলানাথ সভার ভিতরে এগিয়ে এল। উপুড় হয়ে প্রণাম করল। দুহাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'তোঁয়ারার আশিব্বাদে আইয়েদ্দে মাসত কাট্টলিত্তোন আঁর পোয়া বংশীরে বিয়া গরাইতাম চাইর। আঁই সমাজত্তোন বিয়া গরাইবার অনুমতি ভিক্ষা গরির।'

কামিনী জিজ্ঞেস করল, ' বউঅল্যাই ক টিয়া দাভা দেওন পড়ের?'

'হিতারা হাত কুড়ি টিয়া দাবি গজ্যিল। কইবুলি চাইর কুড়িত রাজি গরাই।'

'মাইয়ার বাপ কি কাম গরে? মাইয়া কি বিয়াগুনর বড় নাকি?' কামিনী আবার জিজ্ঞেস করে।

'আঁর বিয়াই পাউন্যা নাইয়া। নাম রাধামঅন। আষ্ট ভাইবোনর মইধ্যে মাইয়া ইবা চাইর লম্বর।' উত্তর দিল ভোলানাথ।

রামনারায়ণ সর্দার বলল, 'এই, তুঁইতো জান, পোয়ার বিয়া গরাইলে গোডা পাইজ্যারে নিমন্ত্রণ খাবান পড়ে।'

'আঁই উগ্গা পেট ঘাউয়া মানুষ। গোডা পাইজ্যারে নিমন্ত্রণ খাবানর শক্তি আঁত্তোন নাই। আঁই শুধু এক পক্ষ খাবাইয়্যম।' বিনীতভাবে কথাগুলো বলল ভোলানাথ।

বৃদ্ধ যোগেন্দ্র বিড়ি টানতে টানতে বলল, 'এক পক্ষ?'

'হ, আঁই শুধু মরতপোয়া অলেরে খাবাইয়্যম। বিয়াগুনেরে খাবানর আঁর বঅর আশা আছিল। কিন্তু আশা থাইলে কি অইবো? শক্তি নাই। এক পক্ষরে খাবাই বিয়াগিন গরানর অনুমতি দও তোঁয়ারা।' গলায় যথাসাধ্য কাতরতা ফুটিয়ে তুলল ভোলানাথ।

কামিনী বিজনের দিকে ফিরে বলল, 'তুঁই কি কও কাজইল্যার বাপ?'

'কী আর গরিবা। পোয়ার বিয়া উডাইতো দওন পড়িবো।' বাঁহাতে সিগারেট টানতে টানতে বলল বিজনবিহারী। ইদানীং সে বিড়ি খায় না, সিগারেট খায়। এক প্যাকেট সিগারেট সে সবসময় পকেটে রাখে।

সভার উদ্দেশে রামনারায়ণ বলল, 'তোঁয়ারা কি কও?'

সভা থেকে আওয়াজ উঠল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আঁরা রাজি।'

যুবরাজ উচ্চস্বরে বলে উঠল, 'বল রাধা কৃষ্ণ সাধু প্রীতে হরি হরি বল।'

সবাই একস্বরে বলল, 'বল হরি।'

এটা স্বীকৃতির ধ্বনি। জেলেসমাজের লোকেরা কোনো শুভ সিদ্ধান্তে উপনীত হলে সভায় এরকম ধ্বনি দেয়। আজও এই ধ্বনি বংশীর বিয়ের সামাজিক অনুমতির বার্তা আশপাশে ছড়িয়ে দিল।

সভা ভাঙো-ভাঙো অবস্থায় গঙ্গা সভার মধ্যস্থলে এগিয়ে এল। সবাইকে প্রণাম করে বলল, ' আঁই একখান কথা কইতাম চাইর।'

সবাই বাইশ বছরের এই তরুণের দিকে তাকালো। এ ছেলেতো সাধারণত কথা বলে কম। সভায় বলার মতো তার কী আর্জি থাকতে পারে? সবার চোখেমুখে ঔৎসুক্য।

পূর্ণ বহদ্দার বলল, 'তুই কি কতি চাওর গঙ্গা?'

গঙ্গা কোনো ভূমিকা না করেই বলা শুরু করল, 'আঁরা কি হারাজীবন মাইর খাইয়্যম না? ডাকাইত অলে তোঁয়ারার মাছ কাড়ি লই যার গই। কূলত আর এক ডাকাতি। দাদনের দোয়াই দি তোঁয়ারার বিয়াগ মাছ পেরাই বিনা পয়সায় লই ফেলের শুক্কুর ও শশিভূষণ কসাই। তোঁয়ারা যদি চুপ গরি থাক, তইলে ভবিষ্যতে আর জাল বোয়াইত পাইত্যা নো।'

'কীত্তাম? আঁরা কি গরিত পারি?'জিজ্ঞেস করল বিজন বহদ্দার।

'দইজ্যার ডাকাইত অলর বিরুদ্ধে আঁরাত্তোন পাল্টা আক্রমণ গরন পড়িবো। বিয়াগ নৌকাত লাডি সোডা, ইট রাখন পড়িবো। এক নৌকাত ডাকাতি শুরু গইল্যে বিয়াগ নৌকা একত্রে হিতারার উঅদ্দি ঝাঁপাই পড়ন পড়িবো'—বলল গঙ্গা।

জয়ন্ত সভার একপাশে বসে ছিল। রাতে চোখে দেখে না। গঙ্গা তাকে হাত ধরে এনে ওখানে বসিয়ে দিয়েছে। ডান হাতটাকে সামনে প্রসারিত করে সে বলে উঠল, 'আর এইসব কসাই অলত্তোন দাদন লইয়েরে আইয়েদ্দে বছর বেবসা নো গইজ্যো। আজিয়া কামিনী বহদ্দাররে মাইজ্যে। কালিয়া বিজন, পূর্ণ, রামনারায়ণ বহদ্দাররে নো মারিবো কনে কঅর?'

'তইলে বেবসা কেএন গরি গরিবো। জাইল্যা অলত্তোন টিয়া আছেনি?" রাইমোহন বিয়ারি বলল।

'এখনোত্তোন কিছু কিছু টিয়া জমাও। আইয়েদ্দে বছর বিজন জেডা, রামনারায়ণ মামা, গোলকবিহারী দাদু যারাত্তোন টিয়া নাই হিতারারে কিছু কিছু সাহায্য গরিবো'—গঙ্গা বলল।

বিজন চমকে গঙ্গার দিকে ফিরে বলল, 'আই কত্তুন টিয়া দিয়্যম?'

'তুঁই ন ডরাইও জেডা। যারা টিয়া লইবো হিতারা তোঁয়ারে সামান্য লাভ দিব। টিয়া তুলি দওনর দায়িত্ব আঁরাত্তোন। আঁরা যুবক অলে মিলি উগ্গা কমিটি গইজ্যম। হেই কমিটি টিয়া তুলি দিব। টিয়া পাড়ি থাওনত্তোনো লাভত খাডান ভালা নো না?' বিবাহার্থী বংশী সভার পেছন থেকে কথাগুলো বলল।

অনেক সলাপরামর্শের পর সভায় ঠিক হল শুক্কুর ও শশিভূষণ থেকে আগামী বছর দাদন নেয়া হবে না। জলডাকাতের আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করা হবে।

তরুণ সমাজের এই জাগরণ বয়ঃবৃদ্ধদের ভাল লাগল। মানুষরা বলাবলি করতে লাগল, শুক্কুর শশিভূষণ কি এমনি এমনি ছেড়ে দেবে?

সভার সিদ্ধান্ত অচিরেই শুক্কুর-শশিভূষণের কাছে পৌছে গেল।

আমারবই.কম

বর্ষাকাল শেষ হল। জেলেদের দুর্দিন শুরু হল। সমুদ্র নিষ্ফলা হতে শুরু করল। ইলিশের পর লইট্যা, লইট্যার পর চিক্কা ইচার মরসুম এলো। চিক্কা ইচা কম দামের মাছ। এই মাছ বিক্রির টাকা জেলেদের জীবনে সচ্ছলতা আনে না। মাছ বিক্রির টাকায় বহদ্দাররা শুধু নিত্যদিনের অভাব মেটায়। বিয়ারিরা এই মাছ বিক্রি করে কোনোদিন লোকসান দেয়, আবার কোনোদিন লাভ করে। লাভের পরিমাণ হয় খুবই সামান্য। এই সময় তাদের জোড়াতালির জীবন শুরু হয়। সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়ে টাউঙ্গা ও হরিজাল নির্ভর জেলেরা। খালবিল শুকিয়ে যাওয়ার ফলে তাদের আয় প্রায় শূন্যে এসে ঠেকে। এর ওর কাছে ধারকর্জ করে চালডালের সংস্থানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তারা।

এবার অভাবটা সবার আগে দেখা দিল মধুরামের পরিবারে। মধুরামের দুই ছেলে। বউটা ছোটোখাটো। পাড়ার সবাই তাকে টুনিবউ বলে ডাকে। সীতাকুণ্ডের হরগোবিন্দ বহদ্দারের বাড়িতে মধুরাম এ বছর গাউর খাটতে গিয়েছিল। মরসুম শেষে মধুরাম আর উত্তর পতেঙ্গায় ফিরে আসেনি। হরগোবিন্দ বহদ্দারের বিধবা

মেয়েটিকে সাঙ্গা করে সেখানেই থেকে গেছে। টুনিবউ নাবালক বাচ্চা দুটোকে নিয়ে তার কাছে গেছে। নানা কাকুতিমিনতি করেও মধুরামকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। বাচ্চা দুটোকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সে ভিক্ষে করতে শুরু করেছে। ভিক্ষে করতে সে বাইরে যায় না। বাচ্চা দুটোর হাত ধরে জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে ভিক্ষে করে। কেউ ফিরায় না তাকে। মধুরামকে গালি দিতে দিতে জেলেনারীরা টুনিবউয়ের থলিতে চাল ও নানা রকম আনাজ তুলে দেয়। বলে, 'দরকার পইল্যে আবার আইস্যো। শরম নো গইজ্যো। মনর বল নো হারাইও।'

টুনিবউ এ-বাড়িতে গিয়ে মরিচ বেটে দেয়, ও-বাড়িতে চাল ঝাড়ে। বহদ্দার বা বিয়ারির উঠানে মাছ এলে বেছে দেয়। সবাই খুশি হয়ে তাকে সাহায্য করে। কেউ দেয় খাবার মাছ, কেউ দু'চারটা টাকা তার দিকে এগিয়ে দেয়। দুপুর গড়িয়ে গেলে সে বাচ্চা দুটো নিয়ে ঘরে ফিরে। জরাজীর্ণ শণের ঘর। মেরামতের অভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ছেলে দুটো ক্ষুধার যন্ত্রণায় কঁকায়। টুনিবউ মধুরামকে গালি দিতে দিতে রান্না করে আর সুর করে কাঁদে। রান্না শেষে বাচ্চাদের খেতে দেয়। নিজেও খায়। বাচ্চারা উঠানে খেলে, টুনিবউ দুমড়ে মুচড়ে দাওয়ায় শুয়ে থাকে।

টুনিবউ আজ বাচ্চা দুটোকে নিয়ে ভুবনদের উঠানে এসে দাঁড়ালো। ছোট বাচ্চাটির পরনে সেঁটি। উদোম গা। নাক দিয়ে শ্লেষ্মা গড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পর বাচ্চাটি সে শ্লেষ্মা জিহ্বা দিয়ে চাটছে। বড়টার গায়ে ছেঁড়া একটা গেঞ্জি। কখন ধোয়া হয়েছে তার ঠিক নেই। পরনে শতছিদ্র একটা হাফ প্যান্ট। রঙ চটে যাওয়া একটা শাড়ি পরেছে টুনিবউ। মাথায় কাপড় তোলা। খোঁপাটি শাড়ির ছেঁড়া অংশ দিয়ে বেরিয়ে আছে। উঠানে দাঁড়িয়েই সে ডাক দিল, 'ও কাকিমা, বাড়িত আছ না?' অনেক দ্বিধা তার কণ্ঠস্বরে।

ডাক শুনে ভুবন ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। টুনিবউদের দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। বলল, 'আইয়ো আইয়ো।'

টুনিবউ বাচ্চাদের নিয়ে দাওয়ার দিকে এগুলো। ভুবন ঘরে ঢুকে গেল, আবার কাঁচা মরিচ নিয়ে এলো। থলিতে ঢেলে দিতে দিতে বলল, 'ভিক্ষা গরি কদিন চলিবা। মাইনষেওবা কদিন তোঁয়ারে ভিক্ষা দিবো?'

'আঁই কী গইজ্যম কাকি, দিশা নো পাইর। পোয়াউন নো থাইলে দইজ্যাত ঝাঁপ দিতাম।'

ভুবন দরদিকণ্ঠে বলল, 'নো ভাইঙ্গো, বাঁচি থাওন পড়িবো। ইতারারে বাঁচাই রাইখ্‌তা নো? আঁর মত মাছ বেচ। কালিয়াত্তোনই বেচ।'

টুনিবউ বলল, 'পোয়াউনেরে কডে রাই যাইয়্যম?'

'পাড়ার মইধ্যে এ-বাড়ি ঐ-বাড়ি গরি থাইবো। হিতারাল্যাই চিন্তা নো গইজ্যো। খেলা খাইতে খাইতে সময় কাডি যাইবো গই।'

মাথায় মাছের খাড়াং নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করা টুনিবউয়ের ভাল লাগে না। গায়ে মাছের পানি পড়ে। মাছের পানির আঁশটে গন্ধে তার বমি আসে। তার দুর্বল শরীর। এসব খাটাখাটুনি তার দ্বারা হবে না। তার চেয়ে এই-ই ভাল। বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করা। ভুবনের কথায় টুনিবউ বলল, 'না কাকি, মাছ নো বেইচ্যম। এ'নেই ভালা আছি। ভিক্ষা গরি দিন চলি যার গই।'

'জাইল্যা অলে তোঁয়ারে কদিন পালিবো। কদিনই বা ভিক্ষা দিব? তখন কেএন গরিবা?' জিজ্ঞেস করল ভুবন।

'তখন নাইত্ পাড়া, হিন্দু পাড়াত্ যাইয়্যম, হিতারা ভিক্ষা নো দিলে মুসলমান পাড়াত্ যাইয়্যম। হিতারা নিচ্চই আঁরে ভিক্ষা দিব।' প্রবল বিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বলল টুনিবউ।

ভুবন বুঝল—টুনিবউকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না। মাছবিক্রির চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তিই তার বেশি পছন্দ। ভুবন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তুঁই যিয়ান ভালা বুঝ গর। আবার আইস্যো।'

টুনিবউ কিছু না বলে ছোট বাচ্চাটার হাত ধরে অন্যবাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

জেলেপাড়া থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে, কর্ণফুলী নদীর পাড়ে হাট বসে—কমলমুন্সির হাট। মানুষের মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে এই হাটের নাম হয়ে গেছে কঁইল্যার হাট। জেলে ও জেলেনিরা সেই হাটে মাছ বেচতে যায়। যেদিন হাটে যায়, সেদিন পাড়ায় ঘুরে ঘুরে মাছ বিক্রির ক্লান্তি থেকে রেহাই পায় তারা। হাটে নানা জায়গা থেকে ক্রেতা-বিক্রেতারা আসে। নদীর ওই পাড়ের জলধি গ্রাম থেকে চাষীরা ঢেড়শ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, চিচিঙ্গা, বরবটি, মূলা, টমেটো, সীম ইত্যাদি আনাজ-তরকারি নিয়ে আসে। জেলেরাও নানাজাতের মাছ নিয়ে কঁইল্যার হাটে যায়।

জেলে-জেলেনিরা বসে হাটের একপাশে, সংকীর্ণ স্থানে। খুব বড় জায়গায় বসে মাছ বিক্রির অধিকার তাদের নেই। পায়ের নিচে কাদা থিকথিক করে। সামনে মাছের খাড়াং রেখে পেছনে বসে বা দাঁড়িয়ে মাছ বেচে তারা। অধিকাংশ পুরুষ দাঁড়িয়েই বেচে। জেলেনিরা পাশাপাশি পিঁড়িতে বসে এক নাগাড়ে হেঁকে যায়, 'লইট্যামাছ, ভালা লইট্যামাছ, ও বদ্দা, লই যাও।'

'আঁর লইট্যামাছ এক জোআর। মাছর গাআত ইক্কিনি দাগ নাই। তরতাজা, লাল লাল লইট্যা।'

'অ বা, আঁর চিক্কা ইচাগুন চাও। টক্‌টইক্যা লাল। খর বাইয়নদি খাইলে যদ্দুর যাইবো, খবর অইবো।'

'অ চাচা, দেইখ্যনি ইলিশমাছ ইবা। রুয়ার মতো চক্‌চইক্যা। তোঁয়াত্তোন দাম বেশি লইতাম নো। আঁর চাচী খুশি অইব।'

জেলেরাও কম যায় না। তারাও নানা রঙদার কথা বলে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কেউ বলে, 'পোঁয়ামাছ উন দেইখ্যনি? এক্কেবারে নোয়া বউঅর মত। গা দি তেল ঝরের।'

আবার কেউ হেঁকে যায়, ' তিন টিয়া, তিন টিয়া সের। এই রইম্যা জাম্বুস লইট্যা মাত্র তিন টিয়া সের।'

আজ কমলমুন্সির হাটে ভুবন, বংশীর মা, গুড়াবি, মালতির মা পাশাপাশি বসেছে। অন্যরা মাথায় করে সেই সমুদ্রকূল থেকে মাছ বয়ে আনলেও ভুবনকে বয়ে আনতে হয়নি। গঙ্গা ভারে করে চিক্কা ইচা নিয়ে হাটে এসেছে। পাশেপাশে হেঁটে এসেছে ভুবন। মাকে মাছ বেচতে বসিয়ে দিয়ে মায়ের পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গা। বাজার জমে উঠেছে। মাছের বাজারে নানা বয়সের ক্রেতার ভিড়। অন্যান্য জেলে জেলেনিরা ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে হেঁকে গেলেও ভুবন চুপচাপ। অপিতে অপিতে [illegible] করলেও [illegible] সে চিৎকার করে না। আসল তার ইচামাছগুলো তাজা এবং বড়। সেজন্যে ক্রেতার ভিড়ও লেগে আছে তার সামনে। কেউ এক সের, কেউ আধ সের, কেউ বা দুই সের কিনে থলিতে ভরে নিচ্ছে। গঙ্গা পেছনে দাঁড়িয়ে দাম নিচ্ছে। মধ্যবয়সী একজন লোক হঠাৎ চিৎকার করে বলল, 'অই ভুমিনি, কত্তেত্তোন দাম পুচ গরির দে, দাম কা নো কঅর'—বলেই সে ছাতার বাঁট দিয়ে ভুবনের মাথায় ঠেলা দিল। বাঁটের ঠেলায় ভুবন চিৎ হয়ে পড়ে গেল। তার হাত মুখে গায়ে কাদায় মাখামাখি। পরমুহূর্তেই গঙ্গা ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির ওপর। লোকটি বুঝে উঠার আগেই ধমাধম কিল ঘুষি চালাতে লাগল গঙ্গা। হুলুস্থুলে লোক জমা হয়ে গেল। হাটুরেরা দুই ভাগ হয়ে গেল। একভাগ বলল, 'হিতারা লইল্যা বুলি মাইয়াপোয়ার গাআত ছাতি দি ডিক্কা মারি চিৎ গরি ফেলাই দ'এন পড়িবো না? জাইল্যাঅলে হেইল্যা আঁরার মাইয়াপোয়ার গাআত হাত দিলে আঁরা ছাইত্তাম না?'

আর একদল বলল, 'ডোম অলর লগে মুসলমানর কিঅর তুলনা, ডোম ডোম। ডোম অইয়েনে মুসলমানর গাআত হাত। ওই চোদানির পোয়ারে পিসি ফেল।'

মাছ বিক্রিরত জেলেরা এগিয়ে এলো। গঙ্গাকে আড়াল করে দাঁড়াল তারা। দু'চারজন সৎবুদ্ধি সম্পন্ন হাটুরেকে উদ্দেশ্য করে বলল, মায়ের গায়ে হাত তোলায় বাপমরা ছেলেটি সহ্য করতে পারেনি। মাকে সে খুবই ভালবাসে। তার অপমান ছেলেটির গায়ে খুব করে লেগেছে। সেজন্যে সে এরকম বেয়াদবি করে বসেছে। আমরা সবাই তার হয়ে মাফ চাই।

কিছু বিবেকবান মানুষের মধ্যস্থতায় সেদিন কোনোরকমে গঙ্গা অক্ষত দেহে বাড়িতে ফিরতে পারল। কিন্তু সুস্থ মন নিয়ে ফিরল না। তার চোখে বারবার তার

মায়ের কাদায় চিৎ হয়ে পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটি ভেসে উঠতে লাগল। দুর্মর কষ্ট আর অদম্য রাগ তাকে কুরে কুরে খেতে লাগল।

সে-রাতে জেলেপাড়ার যুবকরা একে একে গঙ্গাপদদের উঠানে জড়ো হল। প্রথমে বংশীর হাত ধরে এলো জয়ন্ত। তারপর জগদীশ, এরপর অনিল। ঠাকুরদাস, বিষ্ণুপদ, সুনীল—ধীরে ধীরে বিশ-পঁচিশ জন জেলেযুবকের সমাবেশ ঘটে গেল সেখানে। উঠানের মাঝখানে বিছানো পাটিতে খুব কাছাকাছি বসল তারা। ভুবনেশ্বরীর অপমানের কথা শুনেই এসেছে তারা। এসেছে গঙ্গার সাহসের প্রশংসা করতেও। যে-কাজটা পুরুষ পরম্পরায় জেলেসমাজ করতে পারেনি, সেটা করে দেখিয়েছে আজ গঙ্গা। নানা ছল-চাতুরির আশ্রয়ে উচ্চকোটির মানুষরা তাদের সঙ্গে যুগ-যুগান্তর ধরে হীন আচরণ করে আসছে। কেউ কোনোদিন এর প্রতিবাদ করেনি। বরং কপালের লিখন বলে ধরে নিয়ে এসব অত্যাচার-অবিচারকে নীরবে সহ্য করে গেছে। আজ অর্ধশিক্ষিত আপমরা গঙ্গাপদ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। হাটে তার সমূহক্ষতি হতে পারতো। হয়তো বিবেচক মানুষগুলো মধ্যস্থতা না করলে গঙ্গা হাট থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে পারতো না। ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে যে-গঙ্গা মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে পিছপা হয়নি, সেতো ফেলনা নয়, ফেলনা হতে পারে না। সে জেলেদের চোখ খুলে দিয়েছে। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে প্রতিবাদ করতে হবে। এটাই জেলেযুবকরা আজ গঙ্গার কাছ থেকে শিখল।

তবে এই প্রতিবাদকে অবিরত রাখা একা গঙ্গার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রতিবাদ করতে হবে সংঘবদ্ধভাবে এবং করতে হবে যুবকদেরকেই। বয়স্ক জেলেরা একাজে এগিয়ে আসবে না কখনো। কারণ, আবহমানকালের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার ব্যাপারটাই তারা ভুলে গেছে। তাই প্রতিরোধ করতে হবে যুবকদেরকেই।

অনিল গঙ্গার উদ্দেশে বলল, 'আজিয়া যে-কাম গরি দেখাইও তুঁই, গঙ্গা, তোঁয়ারে নমস্কার গইত্যে ইচ্ছা গরের।'

'আঁই কিছু নো গরি। আঁই হুদা আঁর মার অপমানর পতিশোধ লইতাম চাইদে।'

'এই রইম্যা অপমান যুগযুগ ধরি বহুত জাইল্যা অই আইয়ের, কিন্তুক কনউক্কা পতিবাদ নো গরে। তুঁই গইল্যা। তুঁই আঁরার চোখ খুলি দিঅ, গঙ্গা'—জগদীশ বলল।

'চাও, আঁরার নৌকা ডাকাতি গরের দইজ্যাত, দাদনদার অলে দাদনর দোয়াই দি বিয়াগ মাছ কাড়ি লর। নৌকা কুলাইলে যে যেএন ইচ্ছা হাতত ধরি মাছ লই যার গই। জনইপ্যার বাপর মতো মানুষ মাইয়াপোয়ার গাআত হাত তোলের। ইয়ানর এক্খান পতিবিধান গরন দরকার।' চোখ বন্ধ করে কথাগুলো যুবকদের উদ্দেশে বলল জয়ন্ত।

'হিয়ান ছাড়া, সর্দার অলে ঠিক গইজ্যে, আইয়েদ্দে বছর দাদন লইতো নো। গুরুর-শশিভূষণ আঁরার ক্ষতি গরিবো বুলি মনে অর।' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে রামদাস বলল।

'তইলে কি গরন যায়?' বিষ্ণুপদ জিজ্ঞেস করল।

জয়ন্ত বলল, 'বিপদর সমত বহদ্দার অলরে সাহায্য গরন পড়িবো। যদি গঙ্গার মার মতো কুনোক্কা অপমান অয়, তইলে একহঙ্গে আঁরাত্তোন ঝাঁপাই পড়ন পড়িবো।'

'তুঁই আর গঙ্গাপদ মিলি যিয়ান কইবা ভবিষ্যতে হিয়ান আঁরা মাইন্যম। কি কও তোঁয়ারা?' জগদীশ উচ্চস্বরে যুবকদের উদ্দেশে বলল।

সবাই বলল, ' জগদিশ্যা ঠিক কইয়ে। আঁরা তোঁয়ারার পরামর্শ মানি চইল্যম।'

গাঢ় একটা উত্তেজনা নিয়ে জেলেযুবকরা যার যার ঘরে ফিরে গেল।

আমারবই.কম

গতরাতে বংশীর বিয়ে চুকে গেছে। নামন্ত বিয়ে। গতকাল সকালে কনেকে কাট্টলি থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। বিকেলে এসেছিল মেয়ের পক্ষের লোকজন। রাত দশটায় লগ্ন ছিল। পাড়াপ্রতিবেশী, সর্দার, মুখ্যদের উপস্থিতিতে বিয়েটা সুসম্পন্ন হয়েছে। আজ সকালে বাসি বিয়েও হয়ে গেছে।

আজ সামাজিক নিমন্ত্রণ। অভ্যাগত অতিথি ও পাড়ার পুরষপক্ষকে আজ দুপুরে খাওয়াতে হবে। উঠানের এককোনে পাচক তার সহযোগীদের নিয়ে রান্নায় ব্যস্ত। জেলেদের নিমন্ত্রণে মাংস নিষিদ্ধ। রুইমাছ, কলুইর ডাল, মাছের মাথা দিয়ে ঘণ্ট ও কচুশাক রান্না হচ্ছে। জেলেসমাজের নিমন্ত্রণে লাক্ষা শুঁটকি খাওয়াতেই হয়। ওটা বিশেষ খাবার। লাক্ষা শুঁটকি দিয়ে জেলেরা দু'গ্রাস ভাত বেশি খায়। সেই বিশেষ খাবারটি রান্নার আয়োজনও চলছে। গতকালই জয়ন্ত, গঙ্গা, জগদীশ, কমলহরি, অনিল ইত্যাদি যুবকরা এসে বিয়ের কাজে হাত লাগিয়েছিল। আজকেও সুষ্ঠুভাবে নিমন্ত্রণ খাওয়ানোর ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে তারা।

একফাঁকে জগদীশ গঙ্গার উদ্দেশে বলল, 'ও গঙ্গা, বংশীর বউয়েরে দেইখ্য না? একবারে ফট্‌ফইট্যা। তোঁয়ার বউও যেএন বংশীর বউয়র মত অয়। চাইও আবার কালামালা বিয়া নো গইজ্যো।'

গঙ্গা বলল, 'কডে রইয়ে বিয়া। কডে রইয়ে বউ। তুঁই দেখর বউঅর স্বপ্নন।'

'স্বপ্নন নো, স্বপ্নন নো। হাঁচা কথা। কালিয়া রাতিয়া তোঁয়ার মা বংশীর মার লগে তোঁয়ার বিয়া লই কথা কইতে আঁই হুন্নি। বা'জি, তোঁয়ার সুগর দিন আই গেইয়ে গই'—বলতে বলতে বিশ্রীভাবে চোখ টিপলো অনিল।

'অবা, তোঁয়ারার কাম হরনি? খাওনর পানিইন গফুইজ্যার পইরোত্তোন আনা হইয়ে নি?' বংশীর বাপ যুবকদের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

গঙ্গা তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, 'পানি আনা হইয়ে জেডা।'

'ভালা ভালা'—বলতে বলতে দূরে সরে গেল ভোলানাথ।

উঠানে লম্বা করে ভাইজ্যাবাঁশ পেতে দেয়া হয়েছে। পুরুষরা এসে সেই বাঁশে পাশাপাশি খেতে বসেছে। যার যার থালা গ্লাস বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে। পাতে ভাত ও কচুশাক দেয়া হয়েছে। দেয়া সাঙ্গ করে পরিবেশনকারী যুবকরা উঠানের একদিকে গিয়ে অভ্যাগতদের উদ্দেশে মাটিতে উপুড় হয়ে নমস্কার করল। এই সময় শান্তিমোহন হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জেলেদের উদ্দেশে বলল, 'আঁর এক্‌খান কথা আছে।'

সবাই খাওয়া থেকে বিরত হয়ে তার দিকে তাকাল।

'গত সনত হরেকৃষ্ট পোয়ারে বিয়া গরাইয়ে। কিন্তুক নিমন্ত্রণ নো খাবা। কইল্‌দে ছয় মাসর মইধ্যে খাবাইবো। এক বছর পার অই গেহয়ে গই। নিমন্ত্রণ নো খাবা। আজিয়া পোয়াছা লই নিমন্ত্রণ খাইতো আইস্যে। ওরে লই আঁরা নিমন্ত্রণ কেএন গরি খাইয়াম?' বলল শান্তিমোহন।

'তই, কিইত্তা কও?' পাশে বসা হরিপদ জিজ্ঞেস করল।

উঠানের অন্যদিকে বসা রামকানাই বলে উঠল, 'কি গরিবো নো জান? হরেকৃষ্ট এই নিমন্ত্রণ খাইত পাইত্তো নো। আর যদি খা, তইলে আঁরা খাইতাম নো।' বলেই বসা থেকে উঠে পড়ল সে। তার দেখাদেখি পনেরো-বিশজন দাঁড়িয়ে গেল। ভোলানাথ ও বংশীর মা দেখল তাদের নিমন্ত্রণ ভেস্তে যাচ্ছে। এ সমস্যার সমাধান না হলে জেলেরা না খেয়ে যার যার ঘরে ফিরে যাবে। নষ্ট হবে তাদের অনেক কষ্টের খাবার। স্বামী-স্ত্রী হাতজোড় করে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগল। হরেকৃষ্টর পক্ষেও কিছু লোক জুটে গেল। তারা বলতে লাগল, 'নো পাইল্যে কত্তোন খাবাইবো?'

গঙ্গাও তাদের বোঝাতে লাগল—গরিব মানুষের খাবার। অনেক কষ্টে সঞ্চিত টাকা দিয়ে বংশীর মা-বাপ এ নিমন্ত্রণের আয়োজন করেছে। খাবার নষ্ট করা উচিত হবে না। পক্ষে-বিপক্ষে চরম এক তর্ক শুরু হয়ে গেল। হাতাহাতি শুরু হবে হবে এইসময় সেখানে বিজন সর্দার উপস্থিত হল। সমুদ্র থেকে আসতে একটু দেরি হয়েছে বলে যথাসময়ে সে নিমন্ত্রণ খেতে আসতে পারেনি। হৈচৈ শুনে কাদামাখা শরীর নিয়ে বংশীদের উঠানে উপস্থিত হয়েছে সে।

গঙ্গা এগিয়ে এসে বলল, 'জেডা, ইয়ানর এক্‌খান সমাধা গরি দও। নো খাই গেলেগই বংশীর বাপর বউত ক্ষতি অই যাইবো গই। হিয়ান ছাড়া আঁরা যদি একজন আরেক জনর দুঃখ নো বুঝি, তইলে সমাজ চলিবো কেএন গরি?'

উভয় পক্ষকে বিজন সর্দার শান্ত করল। হরেকৃষ্টকে বিজন জিজ্ঞেস করল, 'কঁত্তে নিমন্ত্রণ খাবাইবা?'

হরেকৃষ্ট বিমর্ষ মুখে বলল, 'ফাউন মাসত খাবাইয়্যম।'

তার প্রতিশ্রুতিতে ও বিজন সর্দারের মধ্যস্থতায় জেলেরা শান্ত হল এবং যার যার খাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তেরো

মাঘ মাসের শুরুতে একরকম হঠাৎ করেই বিয়েটা হয়ে গেল গঙ্গার। পৌষের প্রথমদিকে গৌরাঙ্গ সাধু যথাবেশে যথারীতি উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ায় এসেছিলেন। গেলোবার গঙ্গার পড়া বন্ধ করে দেয়ার কথা শুনে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন তিনি। তবে দীনদয়ালের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, তার উদ্যোগ দেখে তার বিমর্ষ ভাব অনেকাংশে কেটে গিয়েছিল। ভেবেছেন—এক গঙ্গা পড়া থামিয়ে দিলে কী হবে, অন্যে গঙ্গা তো পড়া শুরু করেছে। এবার নিশ্চয়ই জেলেপাড়ায় শিক্ষার জোয়ার আসবে। দীনদয়ালের প্রশংসা করতে করতেই সেবার তিনি গ্রাম ছেড়েছিলেন।

পৌষের পড়ন্ত বিকেলে ভুবনদের উঠানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন গৌরাঙ্গ সাধু। গায়ে ঘি-রঙের মোটা কাপড়ের একটা চাদর। চুলগুলো উসকোখুসকো। কিন্তু মুখটা প্রশান্ত। চোখ দুটো উজ্জ্বল। কী এক নিবিড় আশার আলো সে-চোখে জ্বলছে। ভুবন ভক্তি সহকারে প্রণাম করে জলচৌকিতে বসতে দেয় তাঁকে। নানা সুখ-দুঃখের কথার এক ফাঁকে সাধু ভূমিকা ছাড়াই ভুবনকে বললেন, 'গঙ্গারে বিয়া গরাই দও জননী।'

'গঙ্গারে বিয়া গরানর আশা মনে মনে আছে বাআজি। কিন্তুক, আশা গইল্যে কি অইবো। বাপমরা পোয়ারে মাইয়া কনে দিব?'

'মাইয়ার খবর আঁত্তোন আছে। দেশ-বিদেশ ঘুরি। নানা রইম্যা মাইয়া চোগত পড়ে। কুঁইরাত উগ্গা মাইয়া আছে। বয়স ইক্কিনি বেশি। চৈদ্দ-পৌদর হইবো। বাপও ভালা মানুষ। বিয়া গরাইবা না মাইয়া হিবারে?' জিজ্ঞেস করলেন সাধু।

'গরাইয়্যম বাআজি।' আনন্দের সুর ভুবনের কণ্ঠে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল কুমিরার যোগেশ বহদ্দারের মেয়ে এটি। তিন ভাই তিন বোনের মধ্যে সবার ছোট। নাম সুমিত্রা। মেয়েটির মুখে মোঙ্গলিয়ান ছাপ। মাঝারি আকার। মাথার চুলগুলো রুক্ষ। চোখ দুটো ভাসা ভাসা। অবাক বিস্ময়ে সেই চোখ দিয়ে পৃথিবীর সৌন্দর্যগুলো গিলে সে। শিশুকালে কোনো এক শীতের রাতে মায়ের কোল থেকে আগুনভর্তি মালসায় পড়ে গিয়েছিল সুমিত্রা। কণ্ঠের নিচে এক খাবলা চামড়া পুড়ে গিয়েছিল তখন। পরে ঘা শুকালেও পোড়া দাগটি মুছে যায়নি। এই দাগটি সুমিত্রার বিয়ের বাজারটি মন্দা করে দিয়েছিল। অনেক গাঁ থেকে বউ হিসেবে নির্বাচন করার জন্যে অভিভাবকরা এসেছিল। বাধ সেধেছিল কণ্ঠলগ্ন সেই পোড়া দাগটি। ফলে সুমিত্রা চৌদ্দ-পনেরো বছর পর্যন্ত

অবিবাহিতই থেকে গিয়েছিল। এই সময় উপস্থিত হল ভুবনেশ্বরী ও বংশীর মা। মেয়ে পছন্দ হয়ে গেল ভুবনের।

বংশীর মা বলেছিল, 'মাইয়াপোয়ার গলার নিচে পোড়া। খিয়াল গইজ্যো নি গঙ্গার মা?'

গঙ্গার মা বলেছিল, 'গজ্যি। আঁরারওতো সমস্যা। পোয়ার বাপ নাই। আইজ কাইল বাপ ছাড়া পোয়ারে কেউ মাইয়া দিত নো চা।'

'গঙ্গা মানি লইবো নি?'

'আঁর পোয়া। বুঝাই কইলে মানি লইবো।' পরম বিশ্বাসে বলেছিল ভুবন।

গঙ্গাপদ মেনে নিয়েছিল। মায়ের কথাই তার কাছে শেষ কথা। বড় দুঃখিনী মা তার। গোটাজীবন দুঃখে কষ্টে বেদনায় কেটেছে। পায়নি কিছুই। হারিয়েছে স্বামী-মা-বাপ-শ্বশুর-শাশুড়িকে। ভঙ্গ হয়েছে তার স্বপ্ন। ছেলেকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার একটা নিবিড় স্বপ্ন তার ভেতরে দানা বেঁধে উঠেছিল। গঙ্গাপদ সে-স্বপ্ন চূর্ণ করে দিয়েছে। এ রকম একজন মাকে কষ্ট দিতে চায় না গঙ্গা। তাই সুমিত্রার শারীরিক ক্ষতের কথা শোনার পরও মায়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গিয়েছিল সে।

পৌষে কথা, কনে দেখা এবং মাঘে বিয়ে। অন্য আর দশটা জলপুত্রের মতোই বৈবাহিক-জীবন শুরু করল গঙ্গাপদ। বউয়ের সান্নিধ্য, মায়ের অশেষ স্নেহ তার জীবনটাকে আনন্দে ভরিয়ে দিল। সুমিত্রা একটু বেশি বয়সে স্বামীর ঘর করতে এসেছে। ফলে অন্য দশটা বালিকাবধূর মতো শ্বশুরবাড়িতে তার ভীতিময় জীবন শুরু হয়নি। স্বামীকে সে সহজভাবে গ্রহণ করেছে। শাশুড়িকে মায়ের মর্যাদা দিয়েছে। গঙ্গা প্রথমদিকেই সুমিত্রাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল তার জীবনে মা-ই সবকিছু। সুমিত্রা গঙ্গার কথাটি অনুধাবন করতে পেরেছিল। ফলে ভুবন সুমিত্রার কাছে ধীরে ধীরে শাশুড়ি থেকে মা-এ রূপান্তরিত হয়ে গেল।

জলপুত্রদের জীবন নানা পালা-পার্বণ, উৎসব-নিরানন্দের মধ্যদিয়ে প্রবহমান থাকল। সমাজ চলল শাসন-অনুশাসনের হাত ধরে। বর্ষায় দারিদ্র্য-অভাব থেকে অনেকাংশে মুক্তি, শরৎ-হেমন্তে দিন এনে দিন খাওয়া, বসন্তে-গ্রীষ্মে দারিদ্র্যের তাড়না। গ্রীষ্মে সামান্য পুঁজি নিয়ে মৎস্যশিকারের প্রস্তুতি, সম্বলহীন জেলেদের দাদনদারদের শরণাপন্ন হয়ে আমস্তক ঋণজালে জড়ানো। এইভাবে আবহমানকাল ধরে মাছমারাদের ভূত-প্রেতে, ঝাড়-ফুঁকে, সংস্কার-কুসংস্কারে বিশ্বাসী জীবনধারা বয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে-বছর এই জেলেজীবনের ধারা অন্যরকম একটা বাঁক নিলো। এই দিগ্‌পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিল গঙ্গাপদ। সে জলপুত্রদের জাগাতে চাইল, করতে চাইল অধিকার সম্পর্কে সচেতন।

এক গভীররাতে গঙ্গা, জয়ন্ত, জগদীশ, অনিল প্রভৃতি জেলেতরুণরা জমায়েত হল বিজন বহদ্দারের দাওয়ায়। সেখানে উপস্থিত থাকল রামনারায়ণ, পূর্ণ,

গোলকবিহারী, কামিনী বহদ্দাররা; এছাড়া আট-দশজন অতিসাধারণ পাউন্যা নাইয়া। গোপালকে বিজন বহদ্দারের পাশ ঘেঁষে বসে থাকতে দেখা গেল। এ বৈঠকে ওরা ঠিক করতে চাইল আগামী মরসুমে দাদনকারীদের কাছ থেকে ঋণ নেবে কি না?

কথাটা জয়ন্তই পাড়ল, 'জাইল্যা অলর মৌসুমর বেশি দেরি নাই। যারাত্তোন টিয়া আছে হিতারা নিচ্চিন্ত। কিন্তুক, তোঁয়ারা যারাত্তোন সরঞ্জাম কিনিবার টিয়া নাই, কি গরিবা?'

'কী আর গইজ্যম। আবার দাদন, আবার শুক্কুর-শশিভূষণ, আবার ঠগনি'—দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল রামহরি।

'আবার মাছ কাড়ি লওন, আবার গালত থাপ্পড়, আবার ঘুরি পড়ি যাওন, আ-বা-র হিসাবত গোজামিল।'—রুক্ষস্বরে বলে উঠল জগদীশ।

'আর কত মাইর খাইবা? জীবনবাজি রাখি যে-মাছ ধরি আন, হেই মাছ আর কতদিন বিনা পয়সায় বিলাই দিবা?' অনিল উত্তেজিত কণ্ঠে বলল।

কামিনী বলল, 'কী গইজ্যম? আঁরার কোয়ালত লেখা আছিল। কেএন গরি খণ্ডায়্যম?'

গঙ্গা এতক্ষণ চুপচাপ এদের কথা শুনছিল। এবার সে বলে উঠল, 'নিজের কোয়ালর লেখা মাইনষে নিজেই বদলাইত পারে। দরকার শুধু হিম্মত আর সহযোগিতা।'

পূর্ণ বহদ্দার আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল, 'নো বুঝিলাম, গঙ্গা তোর কথাগিন ভালা গরি নো বুঝিলাম।'

'তোঁয়ারা নৌকা ভর্তি গরি মাছ মারি আনো। কূলত বই বছর বছর দাদনের ফাঁদত ফেলি হেই মাছ পেরাই বিনা পয়সায় লুডি লই যার গই শুক্কুইজ্যা, শইশ্যা। আঁরা হিয়ান বন্ধ গইত্তাম চাইর এই বছর।' উত্তেজিত অথচ ভাঙা স্বরে বলল গঙ্গা।

'কেএন গরি?' বামহাতের আঙুলে ধরা অর্ধেক খাওয়া সিগারেটটা গোপালের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল বিজনবিহারী।

জয়ন্ত দেরি না করে বলল, 'তোঁয়ারার সহযোগিতার মাধ্যমে।'

'আঁরার সহযোগিতা?'

গঙ্গা বলতে শুরু করলো, 'চাও, আঁরা অর্থাৎ জয়ন্তদা, অনিল, আঁই,এডে যে যে যোয়ান পোয়াঅল উপস্থিত অই, হিতারার বেশির ভাগর কোনো না-জাল নাই। আঁরা শুধু তোঁয়ারার মঙ্গলল্যাই আজিয়া অঁত্তর অই। আঁরারে সাহায্য গর। আঁরা দাদনদারর শোষনর হাত ভাঙি দিয়্যম।'

'কোনো মাইর পিডত আঁরা নাই'—এতক্ষণ চুপকরে-থাকা রামনারায়ণ বলল।

জগদীশ বলল, 'কোনো মাইরপিড নো। শুধু তোঁয়ারা আজিয়া আঁরারে কথা দও শুক্কুইজ্যা শইশ্যাত্তোন দাদন নো লইবা।'

'তইলে জাল বোয়াইয়্যম কেএন গরি'—ছিদাম পাউন্যা ত্বরিৎ জিজ্ঞেস করল।

গঙ্গা একটু উচ্চস্বরে বলতে শুরু করল, 'আঁরা জানি, গেইয়েদে মৌসুমত বিজন জেডা, রামনারায়ণ মামা আর গোলকদাদুর কামাই মা-গঙ্গার আশিব্বাদে বউত বেশি অইয়ে। ইতারা দাদন লউন্যা অলেরে টিয়া দিব। যারা লইবো হিতারা মৌসুমর শেষে সামান্য লাভ দি হেই ঋণ শোধ গরিবো।'

বিজন কি যেন বলতে চাইল। দুই হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে সমবেত জেলেদের উদ্দেশে গঙ্গা বলল, 'তোঁয়ারা কজন দাদন লউন্যা আছ?'

সমবেত জলপুত্রদের মধ্যে ছয়জন হাত তুলল।

গঙ্গা বলল, 'আঁই যে তিনজন বহদ্দারর নাম কইলাম, হিতারা প্রত্যেকে দুইজনরে সাহায্য গরিবো।'

বিজনের চেহারা ম্লান হয়ে গেল। চোখমুখ আঁধার করে রামনারায়ণ বাইরে তাকিয়ে থাকল। শুধু গোলকবিহারী বলল, 'আঁই সাহায্য গইত্যে রাজি।'

'তোঁয়ারা কি কও?' বিজন ও রামনারায়ণের উদ্দেশে গঙ্গা বলল।

তারাও আমতা আমতা করে বলল, 'আঁরাও রা—জি।'

গঙ্গা বলল, 'তোঁয়ারা নো ডরাইও। আঁরা—এই জয়ন্তদা, আঁই, জগদীশ, অনিল ইতারা তোঁয়ারার টিয়া তুলি দিয়াম। লাভ সঅ। আর এক্‌খান কথা মনত রাইখ্যো তোঁয়ারা, মাইর খাইতে খাইতে মাইনষর পিড দেয়ালত ঠেগি গেলে গই মাইনষে ঘুরি থিআ। তোঁয়ারারও ঘুরি থিআনর সময় হইয়ে। আঁরা আছি তোঁয়ারার লগে।'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল পক্ষে বিপক্ষে। গুরুর-শশিভূষণরা সহজে কি ছেড়ে দেবে? ওদের স্বার্থে আঘাত লাগলে তারা কি প্রত্যাঘাত করবে না? যদি প্রত্যাঘাত করে অর্থাৎ জেলেদের কোনো ক্ষতি করে তাহলে তারা কি করবে? ইত্যাকার নানা প্রশ্ন উঠল সমবেত সভায়।

সর্বশেষে জয়ন্ত বলল, 'আঁরা তখন অবস্থা বুঝি বেবস্থা লইয়্যম। আঁই, গঙ্গা, আঁরার উঅর ভরসা রাখ।'

গভীরতর রাতে সভা ভাঙল।

ফাগুন থেকে জ্যৈষ্ঠ—জেলেজীবনে বড়ই নিষ্ফলা সময়। সমুদ্র বড়ই নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের পানি অসহনীয় লবণাক্ত হয়ে গেছে। অগভীর সমুদ্রে মাছ নেই, মাছগুলো স্থানান্তরে গেছে। দু'একজন বহদ্দার ছাড়া অন্য সবাই সমুদ্র থেকে বিহিন্দিজাল তুলে এনেছে। যারা পেটের দায়ে জাল বসিয়ে রেখেছে, তাদের জালে মাছ ধরা পড়ছে নিতান্ত কম। ধৃত মাছগুলো বহদ্দাররা নিজেদের লোক দিয়ে বিক্রি করাচ্ছে। বিয়ারিরা শূন্যহাতে বাড়ি ফিরছে।

আজ ভুবন মাছ কিনতে যায়নি। গতরাতে জ্বরজ্বর বোধ হওয়ায় গঙ্গাও হুরি বা টাউঙ্গাজাল বাইতে যায়নি। বউটি সকালে পাশ থেকে উঠে গেলেও অনেক বেলা পর্যন্ত গঙ্গা বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটিয়েছে। সুমিত্রা শাশুড়ির সঙ্গে দৈনন্দিনের সাংসারিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

সুমিত্রা পুকুরঘাট থেকে রাতের বাসি বাসনকোসন মেজে ধুয়ে আনতে আনতে ভুবন উঠানটি ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করেছে। সুমিত্রা ঘরদোর সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখে। ও আসার আগে ভুবনদের ঘরে একটা আগোছালো ভাব ছিল। গোটাদিনের দুর্বিষহ খাটুনির পর ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার শক্তি ভুবনের গায়ে আর থাকতো না। সুমিত্রার সতর্ক নিষ্ঠায় ভুবনদের বাড়ির শ্রী অনেকাংশে বেড়ে গেছে।

গঙ্গা পুকুরঘাট থেকে হাতমুখ ধুয়ে এলো। থালাভর্তি পান্তাভাত দিয়ে সুমিত্রা গঙ্গাকে ইশারায় ডাকলো। দিনের বেলায় মায়ের সামনে স্বামী-স্ত্রীতে খুব বেশি বাক্যালাপ হয় না। এটাই রীতি। মানুষের সামনে নব-দম্পত্তিরা কথা বলে না। তারা প্রয়োজন সারে ইশারা-ইঙ্গিতে। গঙ্গাপদদেরও যত কথা রাতের বেলায়। পারস্পরিক উষ্ণতায় তখন তারা মুখর হয়ে ওঠে। সেসময় তারা বলে প্রয়োজনের কথা, বলে অপ্রয়োজনের কথা। ভালবাসাবাসির কথা এই জেলেদম্পতির মধ্যে খুব বেশি হয় না। প্রয়োজনের সময় শরীরের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে একাকার হয়ে যায় তারা। সেটাই তাদের ভালবাসা।

গঙ্গা থালাভর্তি পান্তাভাত নিয়ে খেতে বসেছে দাওয়ায়। ভুবনও একটু দূরে বসে ছেলের খাওয়া দেখছে। আর দেখছে পুত্রবধূ সুমিত্রার ভূমিকা। সুমিত্রার মতো করেই একদিন ভুবন শ্বশুরবাড়িতে এসেছিল, তবে তখন তার বয়স ছিল সুমিত্রার চেয়ে অনেক কম। সুমিত্রার মতো ভুবনেরও শাশুড়ি ছিল। শাশুড়ি তাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিল। সুমিত্রার বয়স বেশি হওয়ায় ভুবনকে তত বেগ পেতে হচ্ছে না। মেয়েটি বুদ্ধিমতী। সংসারের কাজগুলো, তার দায়দায়িত্বগুলো সে খুব অল্পসময়ে বুঝে নিতে পেরেছে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে ভুবন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। গঙ্গার কথায় তার সম্বিৎ ফিরল।

গঙ্গা বলছে, 'মা, আঁই তোঁয়ারে জীবনে সুখ দিত নো পাইল্যাম।'

ভুবন গঙ্গার কথা বুঝতে পারলো না। বলল, 'তোর জীবনর কদ্দুর গেইয়ে। গোডাজীবন পড়ি রইয়ে। আর, কি সুখ? কি সুগর কথা কওদ্দে তুই?'

'আঁর বাপ দইজ্যাত ডুবি মারা যাওনর পর তুঁই পতিজ্ঞা গজ্যিলাদে আঁরে পড়াইবা, দইজ্যাত মাছমাইত্য যাইতা দিতা নো। কিন্তুক, আঁই তোঁয়ার হেই আশা পুরাইত নো পারি।' কষ্টমিশ্রিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল গঙ্গা।

ভুবন নিবিড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বিয়াগ মাইনষর আশা ভগমানে পূরণ নো গরে। আঁর ইচ্ছা আছিল, ঠাউরে নো চা। আর তোর কোয়ালত

লেয়াপড়া নো আছিল পাআন্‌লার। হেতল্যাই তুই পড়ালেহা গরিত নো পারস। আঁর চেষ্টা আঁই গজ্যিলাম। হিয়ান আঁর দায়িত্ব বলি মনে গজ্যিলাম।'

মায়ের এসব কথা গঙ্গাকে মথিত করে। সুমিত্রাও দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মা-ছেলের কথা শোনে।

গঙ্গা কোনোপ্রকার ভূমিকা ছাড়াই বলে ওঠে, 'মা, আঁই তোঁয়ার আশা পুরাইয়্যম। আঁত্তোন যদি কোনোদিন পোয়া মাইয়া অয়, আঁই হিতারারে আই. এ, বিএ পাস গরাই তোঁয়ার আশা পুরাইয়্যম।'

'আঁই অ পুত, হেই পথর মিক্কে চাই রই। আঁর বড় আশা আছিল আঁর বংশর কেউ বিদ্বান অইবো। জাইল্যাপাড়ার মাইনষে কইবো—চন্দ্রমণির বাড়ির উগ্গা পোয়া শিক্ষিত অইয়ে, বালেস্টর অইয়ে।'

"মা, আর একখান কথা, আঁর বদ্দি পোয়া অয়, তইলে তার নাম রাখিবা বনমালী। এই নাম্মান আঁর খুব পছন্দ। জয়ন্তদা বনমালীরে লই যখন গান গা, তখন বঅর ভালা লাগে—'বনমালী তুমি পর জনমে হইও রাধা।"

সুমিত্রা দরজার আড়াল থেকে দ্রুত সরে যায়।

ভুবনের চোখ এক গভীর আনন্দে চকচক করে ওঠে। মনের ভেতর গুঞ্জরণ ওঠে—'বনমালী তুমি পর জনমে হইও রাধা।' পুত্রকে কিছু বলতে যাবে এই সময় বাইরে ডাক শোনা গেল, 'অ বদ্দি, বাড়িত আছ না? অ গঙ্গার মা।'

ভুবন দাওয়া থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, গুড়াবি উঠানে দাঁড়িয়ে। ভুবন তাকে দাওয়ায় উঠে বসবার জন্যে আহ্বান জানাল। গুড়াবি দাওয়ায় উঠে এলে সুমিত্রা একটা পিঁড়ি এগিয়ে দিল। এরই মধ্যে খাওয়া শেষ করে গঙ্গা উঠে পড়েছে।

পিঁড়িতে বসতে বসতে গুড়াবি বলল, 'বদ্দি, তুঁই বঅর ভাগ্যমান। চালাকচতুর উগ্গা বউ পাইঅ। চারিমিক্কে কী সোন্দর গরি রাইখ্যে। এই রইম্যা বউ বিয়াগুনর কোয়ালত নো জোটে।'

'তোঁয়ারার আশিব্বাদ'—বলল ভুবন।

'মাইয়া তো ডাঁউর-ডোঁর। আজিয়া বিয়া হইয়ে দে পেরাই চাইর মাস পাআন্‌লার। কনঅ খবর টবর আছেনি?' রহস্যময় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল গুড়াবি।

ভুবন গুড়াবির ইশারা বুঝতে পারল। দিন পনেরো আগে সে জানতে পেরেছে, বউয়ের মাসিক দু'মাস ধরে হচ্ছে না। এই সুখের কথা কাউকে না কাউকে বলবার জন্যে প্রাণটা আইঢাই করছিল। নানা সাংসারিক ঝামেলায় বংশীর মায়ের সঙ্গে দেখাই করতে পারেনি এই ক'দিন। আজকে গুড়াবির জিজ্ঞাসার সামনে ভুবন তার সেই নিবিড় আনন্দকে আর চেপে রাখতে পারল না।

বাঁধভাঙা উল্লাসে বলে উঠল, 'হ, খবর আছে। আঁর নাতি অইবো। দুইমাস ধরি বউঅর মাসিক বন্ধ।'

'ভালা ভালা, খুব ভালা। হে ঠাউর, তুই দুখিনি মার মুখত্ হাসি ফুডাও।' নিমীলিত চোখে কথাগুলো বলল গুড়াবি।

আরও নানা কথাবার্তার ফাঁকে গুড়াবি একসময় বলল, 'বন্দি, তোঁয়ার কাছে আস্যিলাম দে এক সের চইল উধারল্যাই। পোয়ার বাপ গত ক'এক দিন জাল বাইত নো পারের। অওকোষর জ্বালা বাড়ি গেইয়ে গই। দইজ্যাত মাছ নাই। বিয়ারিকাম বন্ধ। যা আছিল বেয়াগ খরচ অই গেইয়ে। গত রাতিয়া ভাত নো রাঁধি। বিয়ানত্তোন পোয়াঅলর যন্ত্রণা সহ্য গরিত নো পারি তোঁয়ার কাছে আস্যিদে।'

আজ ভুবনের মনে অনেক শান্তি। অপার আনন্দের কথা গুড়াবিকে বলতে পেরে খুব খুশি লাগছে তার। এই সুখের সময়ে গুড়াবিকে চাল ধার দিতে কোনো আপত্তি নেই তার। গলাটাকে উঁচু করে ভুবন বলল, 'চইলর ভাইড়ত গরি একসের চইল আনোতো বউ। তোঁয়ার কাকি-হোঅরিরে দিবাল্যাই।'

সুমিত্রা চাল এনে ভুবনের সামনে রাখলো।

গুড়াবি চালগুলো নিয়ে দাওয়া থেকে নামতে নামতে বলল, 'আঁই কতক্ষণ পরে চইলর ভাইড় আনি দি যাইয়্যম বন্দি।'

ভুবন সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

আমারবই.কম

চৌদ্দ

'জেঠমাস শেষ অই যার গই। আইজো কনঅ জাইল্যা টিয়ারলাই নো আইল। ইয়ানর কারণ কি কাকা? কোনো আন্দাজ গইজ্যো নি?' কথাগুলো শশিভূষণের উদ্দেশে বলল গুক্কুর মিয়া।

জেলেরা কেন দাদন নিতে আসছে না—এ ব্যাপারে গোপনীয় সলাপরামর্শের আসর বসেছে গুক্কুরের খামারবাড়িতে। খামারটি জনবসতি থেকে বেশ দূরে ধানিজমির মাঝখানে। মাঠ এখন ফসলশূন্য। খামারবাড়িটির পাশ দিয়ে একটা খাল পূর্ব থেকে পশ্চিমে বয়ে গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। খালটি গভীর। দু'দিকের পাড় বেলে মাটির। বর্ষায় জোয়ারের পানিতে ও বৃষ্টির জলে খালটি পূর্ণ হয়ে যায়। এইসময় জোয়ারের পানির সঙ্গে সমুদ্র থেকে উঠে আসে নানা জাতের মাছ। বর্ষায় প্রচুর মাছ ধরা পড়ে এ খালে। টাউঙ্গা জাইল্যাদের লোভনীয় জায়গা এটি।

দু'পাড়ে ঘন কেয়াবন। সেখানে রাতে আঁধার জমাট বেঁধে থাকে।

খামারবাড়িটির চারদিকে প্রচুর গাছগাছড়া। দুটো কুকুর মাঝেমধ্যে ডেকে উঠছে। খামারটি ঘিরে এক ভৌতিক থমথমে পরিবেশ।

এই খামারেরই একটি ঘরে একটি চৌকিতে বসেছে শশিভূষণ ও গুক্কুর মিয়া। একটু দূরে জলচৌকিতে বসে আছে জনইপ্যার বাপ ও চৌকিদার রঙবাহারের বাপ। শশিভূষণ ও গুক্কুরের কয়েকজন গাট্টাগোট্টা চেলা একটু দূরে চাটাইয়ের

ওপর বসে আছে। আর আছে গোপাল জলদাস। বিজন বহদ্দারের পেয়ারের এই লোকটি চাটাইয়ের এক কোনে ফুর্তিমুখে বসে আছে।

শুক্কুরের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনইপ্যার বাপ বলে উঠল, 'এই রইম্যা গোপন মিটিংঅর জাগাত জাইল্যা উগ্গা আনি বোয়াই রাইখ্যো। তোঁয়ারার কথা গোপন থাইবো নি?'

শশিভূষণ হাসতে হাসতে বলল, 'জাইল্যা অইলে কি অইবো। আস্ত মীরজাফর। জাইল্যা অলর বিয়াগ গোপন কথা, পরিকল্পনা এই গোয়াইল্যাই আঁরারে সাপ্লাই দিএ। ইতে আঁরার মানুষ। আঁরার কিনা গোলাম। তুই কি কস্ গোয়াইল্যা?'

গোপাল হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'আঁইজ্ঞা মহাজন, তুঁই যিয়ান কও।'

'আঁরা গোয়াইল্যার মুখডোন হুনি জাইল্যা অলর ষড়যন্ত্রর কথা। তুহ ক চাহ অডা গোয়াইল্যা ডোমঅলে কী কী গরের।' আদেশের ভঙ্গিতে গোপালকে উদ্দেশ্য করে শশিভূষণ কথাগুলো বলল।

গোপাল প্রথম থেকে গঙ্গা-জয়ন্ত-জগদীশ ইত্যাদির উদ্যোগে দাদন না নেয়ার কথা, বিজন-রামনারায়ণ-গোলকের অর্থনৈতিক সাহায্যের কথা, বিপদের সময়ে জেলেদের পারস্পরিক সহযোগিতার কথা ইনিয়েবিনিয়ে বলে গেল। সবশেষে গড়গড় করে বলল, 'এই কামর মাডর গুরু গঙ্গাইয়া। আর বিজইন্যা চোদানির পোয়া জাইল্যাপাড়ার যুবক পোয়াঅলরে সাহস যোগার।'

চৌকিদার রঙবাহারের বাপ শুক্কুরের কাছ থেকে নানা সময়ে টাকা নেয়। সরকার পক্ষের একজন লোককে হাতে রাখার অভিপ্রায়ে শুক্কুরও অবলীলায় রঙবাহারের বাপকে টাকাটা মাছটা দিয়ে থাকে। তাই শুক্কুরের দুঃসময়ে সকল কাজ ফেলে সে এই পরামর্শসভায় উপস্থিত হয়েছে।

সে বলল, 'এহন জেঠমাস পেরাই শেষ। আষাঢ়মাস শুরু অইতে আর মাত্র দুইদিন বাকি। দেখা যার দে জাইল্যা অলে এই বছর দাদন লইতো নো। যদি দাদন নো ল, তইলে তো তোঁয়ারার বেবসা লাডত উডিবো।'

মাথাগরম শুক্কুর বলে উঠল, 'আঁই চাই লইয়্যম খানকির পোয়া ডোমঅলরে। আর অই চোতমারানির পোয়া গঙ্গাইয়া। আঁরে গত বছর চোরত্ ধরাই দিএ। এই চোদানির পোয়ার পোঁদত আঁই আচাঁইছ্যা ভাইজ্যাবাঁশ ঘল্লাই দিয়্যম।'

'মাথা গরম নো গইজ্যো। ইয়ান মাথা গরমর সময় নো। মাথা ঠাণ্ডা রাই সিদ্ধান্ত লওন পড়িবো।' ধীরে ধীরে বলল এতক্ষণ চুপ-থাকা জোনাব আলীর বাপ।

শশিভূষণ কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকলো। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'জনইপ্যার বাপ ঠিক কইয়ে। অনেক ভাবনাচিন্তা গরি সিদ্ধান্ত লওন পড়িবো। নো ভাবি ধমাধম কিছু গইল্যে ভুল অইবো। তই, এই কথা ঠিক যে, আঁরার বাড়া ভাতত

ছাই দিএ গঙ্গাইয়া। জাইল্যাঅলরে ঘুমত্তোন মাতাই তুইল্যে। হিতার এক্খান বেবস্থা গরন দরকার।' কিছুক্ষণ চুপ মেরে থেকে শশিভূষণ আবার বলতে লাগল, 'আইচ্ছা, তোঁয়ারা এখন যাও। আঁরে আরেক্কিনি ভাবিবার সময় দও। আর অডা গোয়াইল্যা, তুইও যা। কিন্তু জাইল্যাঅলর উঅদ্দি চোখ রাইচ। গঙ্গাইয়া কি গরের, কডে যার হিয়ান ভালা গরি খিয়াল রাইচ।' চোখ টিপে গুক্কুরকে থাকবার ইশারা করে অন্যদের উদ্দেশে শশিভূষণ বলল, 'তইলে তোঁয়ারাও বিয়াগ্গুনে যাও গই। আঁই আর গুক্কুর মিয়া বই ইক্কিনি সুখ-দুখর কথা কই।'

সবাই চলে গেলে নির্জন খামারবাড়িটির সেই কক্ষে গুক্কুর ও শশিভূষণ খুব কাছাকাছি বসল। নিম্নস্বরে বহুক্ষণ কথা হল। একপর্যায়ে শশিভূষণ বলল, 'তইলে ঠিক আছে, এই কথা। মাথা ঠান্ডা রাইবা। আরগিন আঁর উঅদ্দি ছাড়ি দও। চাই ঈশ্বরে কী গরে।'

দুজনে যার যার বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল। পেছনে কুকুর দুটো তারস্বরে ডাকতে শুরু করলো।

আমারবই.কম

দীনদয়াল উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ার জলপুত্রদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলবার সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করে রেখেছে। ভগীরথ ভস্মীভূত সগরবংশকে গঙ্গাসলিলে সিক্ত করে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, আর দীনদয়াল চাইছে জেলে-সন্তানদেরকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করতে।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে পড়ুয়াদের নিয়েই থাকে। যে ছেলেটি পড়ালেখায় একটু ভাল, তার পরিচর্যায় অধিক মনোযোগী হয়। আর যে ছেলেটি মেধাহীন, অমনোযোগী তার মানোন্নয়নে সে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে। জলপুত্রদের শিক্ষাযজ্ঞের সে পুরোহিত। আগে যে জেলেসন্তানগুলো মার্বেল-হাডুডু-গোল্লাছুট খেলায় হরদম নিমগ্ন থাকতো, তারা আজ যথাসময়ে দীনদয়ালের পাঠশালায় যায়। দীনদয়ালের বাড়ি থেকে 'পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল, পাঁচ একে পাঁচ, বি এ টি ব্যাট' ইত্যাদি শব্দতরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার বাড়ির পাশদিয়ে জেলেরা মাছ ধরতে যাওয়ার সময় তাদের সন্তানদের বিদ্যাচর্চার কর্মকাণ্ড দেখে দীনদয়ালের প্রতি আনত হয়, জেলেনারীরা গৃহস্থালির ফাঁকে ফাঁকে তার প্রশংসায় মুখর হয়।

দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। দীনদয়াল তখনো ছাত্রছাত্রীদের ছুটি দেয়নি। নির্ধারিত পড়া শেষ করে আজ সে মহাভারত থেকে ভীষ্মের কাহিনী শোনাচ্ছে তার শিক্ষার্থীদেরকে। ভীষ্মের জন্মকাহিনী, তাঁর মাতৃকাহিনী, তাঁর পিতৃভক্তি, তাঁর বিয়ে না করার কথাগুলো সুন্দর করে সে ছাত্রছাত্রীদের বলে যাচ্ছে। আর নিদারুণ আগ্রহ নিয়ে পড়ুয়ারা তার কথা শুনে যাচ্ছে। কখনো চোখ বন্ধ করে, কখনো গর্জে উঠে, কখনো করুণস্বরে দীনদয়াল বিদ্যার্থীদের মনোরাজ্যে মায়াজাল বিস্তার করে

চলেছে। কাহিনী বলার এক ফাঁকে মঙ্গলী কখন এসে দাওয়ার এক কোনায় বসে পড়েছে, তা দীনদয়াল খেয়াল করেনি।

গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে কাহিনী শেষ হলে মঙ্গলী বলে উঠে, 'মাস্টর, তুঁই এই রইম্যা সোন্দর গরি কথা কইত পার? পোয়াঅলে ক তুঁই ভালা পড়াও। আজিয়া আঁই ইুইন্‌লাম তোঁয়ার মুখত্তোন ধর্মর মধুর বাণী।'

'এরই, তুঁই আঁরে শরম নো দিঅ। হোয়াঅলেরে আনন্দ দিবারলাই আঁই মাঝেমইধ্যে গল্প কই, ধর্মর কথা আঁই কত্তুন কইতে হারমু।' গৌরবমেশানো কণ্ঠে বলল দীনদয়াল।

দুজনের আলাপ শুনে দীনদয়ালের বউ চরণদাসী তার ভারী শরীর নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। গজরাতে গজরাতে কঠিন কণ্ঠে বলল, 'এত ঘুজুর ঘুজুর কিঅল্যাই হর। হড়া শেষ অইলে ছুট্টি না দিবা। অস ছাত্র ছাড়ি বেডি অলেরে হড়ানো শুরু কইচ্ছো নি? বেডি অলর লগে খাজুরা কথা কইতে ভালা লাগে নি?'

মহাভারতের কাহিনী বলতে বলতে দীনদয়ালের মধ্যে একটা সৌম্যভাব জেগে উঠেছিল। বউয়ের কর্কশকণ্ঠের অসহনীয় কথায় সে তার শান্ত মেজাজ ধরে রাখতে পারলো না। সে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, 'এই বিয়াদপ মাইয়াপোয়া, কী কইতি চাস্ তুই।'

'কি কইতে চাই বুঝ না? গুড়া হোয়া হইছো নি? নাকে দুত খাও নি? আঁই বুঝি নানি? ভালা অই যাও গই'—অনেকগুলো প্রশ্নের পরে একটা উপদেশবাণী বেরিয়ে এলো চরণদাসীর কণ্ঠ থেকে। এই উপদেশ দীনদয়ালের গায়ে জ্বালা ধরাল।

দীনদয়াল তার কণ্ঠে আরও জোর ঢেলে বলল, 'তুই হারামজাদি আঁর জীবনডারে নরক বানাই ফেলাইলি। ছাত্রছাত্রীর সামনে, গার্জিয়ানের সামনে তুই আঁরে বেইজ্জত করস্? আঁই কি খারাপ আছিলাম নি? ভালা অই যাতি কস্?'

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া দেখে শিক্ষার্থীরা একে একে চলে যেতে লাগল। মঙ্গলী যাওয়ার সময় দীনদয়ালের দিকে তীক্ষ্ণ একটা কটাক্ষ করে গেল। এর অর্থ দীনদয়াল বুঝল না।

চরণদাসী তখনো বলে চলেছে, 'গার্জিয়ান না আঁর ফেদা। হেতি ইয়ানে বই বই কি অরে? পইত্তো আইয়ে ভাই, চাইতো আইয়ে ভইন। ভগমান, আঁর সংসারত কি চলের আঁই নো জানি ...' নাকিসুরে সে কান্না শুরু করে দিল।

দীনদয়ালের মা বাজার থেকে এসে দেখে বউ কাঁদছে, দীনদয়ালের বাপ সমুদ্র থেকে এসে দেখে বউ কাঁদছে।

দুপুরে খেতে বসেই কথাটা পাড়ল দীনদয়ালের বাপ। 'দেশত্তোন আইছি যেন বউত দিন। ঘরবাড়ি ভাঙ্গি গেছে গই। তঅ পরান কান্দে। বউগাও মা বাপেরে

আমারবই.কম

দেখছে যেন অনেকদিন অইল। বউগা লই তোর মা আর আঁই কদিনরলাই সন্দ্বীপ যাইতাম চাইয়ের। তুই কী কস্? '

ভাতের গ্রাস মুখে তুলে দিতে দিতে দীনদয়াল বলল, 'যাও না। আঁই কি বাধা দিমুনি?'

চরণদাসী ঘরের ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠল, 'আঁই যাইতাম নো।'

পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা দীনদয়ালের মা বলল, 'মাথা গরম নো গইজ্যো বউ। দেশত্ চল। মা বাপেরে দেইলে মনে শান্তি হাইবা।'

'আঁই গেইলে আঁর সর্বনাশ অইবো'—বলল চরণদাসী।

'কী সর্বনাশ? কওছেন বউ, কী সর্বনাশ?' শাশুড়ি উৎকর্ণ হয়ে রইলো বউয়ের উত্তরের জন্যে। কিন্তু চরণদাসী কিছু বলল না। চুপচাপ ভাত-তরকারি পরিবেশন করতে লাগল।

আমারবই.কম

দিন দুয়েক পরে দীনদয়ালের মা-বাপ বউ চরণদাসীকে নিয়ে সন্দ্বীপ গেল।

পনেরো

আমারবই.কম

এ মরসুমেও অন্যান্য মরসুমের মত জেলেরা মাছধরার সরঞ্জামাদি যোগাড় করেছে। সমুদ্রে গোঁজ পুঁতেছে। জাল বসিয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু একটি—তারা শুক্কুর বা শশিভূষণ মহাজনের কাছ থেকে দাদন নেয়নি। অনেক প্রলোভন ও ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়েও জেলেদের দাদন গছাতে পারেনি তারা। গঙ্গা-জয়ন্তের তত্ত্বাবধানে বিজন, গোলক, রামনারায়ণ বহদারের কাছ থেকে টাকা পেয়েছে দাদন গ্রহণেচ্ছু জেলেরা। প্রাপ্ত টাকার সুবাদে তারা স্বচ্ছন্দে বঙ্গোপসাগরে নির্ধারিত পাতায় জাল বসিয়েছে। অন্যান্য বার আষাঢ়ের শেষ দিকে ইলিশ ধরা পড়তে শুরু করলেও এবার মাঝ-আষাঢ়ে ইলিশ পড়ছে জেলেদের জালে। জেলেপাড়ার জীবন অনেকটা নির্ভারে চলতে শুরু করেছে।

আমারবই.কম

বিনাশ্রমের এতোবড় আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে শুক্কুর উন্মত্ত হয়ে উঠল। 'রাঢ়ির পোয়া গঙ্গাইয়া আঁরার এত বড় সর্বনাশ গইল্যো। ইয়ান কিছুতেই মানি লঅন নো যাইবো।' এই কথা ভাবতে ভাবতে গুমরে মরতে লাগল সে।

ঠান্ডামাথার শশিভূষণ শুক্কুরকে নিয়ে বসে শেষপর্যন্ত ঠিক করল—ডোমদের শাস্তি দিতে হবে। উচিত শাস্তি। জীবনের শাস্তি।

ভুবনেশ্বরী মাছবিয়ারির কাজ অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। শরীরটা আর আগের মতো তার কথা মানে না। অল্প মাছ মাথায় নিয়ে দু'চার কদম এগুলে বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। মাথাটাও ঘুরে যায় মাঝেমধ্যে। গঙ্গা মায়ের শারীরিক অবস্থা আঁচ করতে পেরে মাছবিয়ারির কাজ বন্ধ করতে বলে। ছেলের অনুরোধ ও

শারীরিক দুর্বলতার জন্যে সে বিয়ারির কাজ অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। যেদিন মাছ বেচতে যায় না, সেদিন গৃহস্থালির কাজে বউয়ের সঙ্গে হাত মেলায় ভুবন। এটা ওটা করে। সাংসারিক কাজে বউকে তালিম দেয়। বউটার শরীর ভারি হয়ে উঠছে দিন দিন। পাঁচ মাস চলছে। স্বাদভক্ষণের দিন ঘনিয়ে এলো। বামুনঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে দিনক্ষণ ঠিক করতে হবে। বউয়ের বাপের বাড়িতে খবর দিতে হবে। স্বাদভক্ষণের প্রধান আয়োজক তারা। সুতরাং আগেভাগেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগটা সেরে ফেলতে হবে।

মাঝেমধ্যে বংশীর মা আসে, গুড়াবি আসে। জবুথবু শরীর টেনে টেনে রামকালির মাও আসে কোনো কোনোদিন। সুখ-দুঃখের নানা কথা ভাগাভাগি করে তারা।

রামকালির মা বলে, 'তোরা ত এখন ভালা আছস্। পোয়াঅল কামাইন্যা অইয়ে, বউ আছে ঘরত্। পরিশ্রমের চাপ বউত্ কমি গেইয়ে গই।'

কথাগুলো যে বংশীর মা ও গঙ্গার মায়ের উদ্দেশে বলা তা তারা বুঝতে পারে।

বংশীর মা বলে ওঠে, 'আর কোয়ালির দুঃখ নো কমিল। বউত আশা গরি পোয়ারে বিয়া গরাইলাম। বউয়া বঅর থোরাবাউট্টা। হুদা তর্ক গরে। আঁর লগে, পোয়ার লগে। এ'ন কি বংশীর বাপর লগেও। এই বউঅর কারণে সংসারর সুখ বরবাদ অই যার গই।'

'ছোড মাইয়া। বুঝাই হুনাই ঠিক গরন পড়িবো'—গুড়াবি বলে।

বংশীর মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'কী বুঝাইয়াম। কোনোকিছু বুঝাইতে গেলে ফোঁস গরি উডে। বাওরো বাড়ির দেমাগ দেখা। হিয়ানল্যাই বুলি হেদিন্যা আঁর পোয়া বউয়েরে ধরি মাইজ্যে। কী কাঁদা। চিল্লাই চিল্লাই কাঁদি কাঁদি ঘরবাড়ির ইজ্জত লই গেইয়ে গই। আঁর তুলনায় গঙ্গার মা পরম সুগে আছে।'

'তোঁয়ারা আশিব্বাদ গইজ্যো। আঁর বাপমরা পোয়া। সংসারত যেএন ইক্কিনি সুখ পা'—বলল ভুবন।

রামকালির মা বুড়ি বলে, 'তোর বউঅর শরীল ভারি মনে অইল?'

'হ, পাঁচ মাস। আইয়েদ্দে মাসত স্বাদভক্ষণ। তোঁয়ারাত্তোন আইয়েরে কাম্মান উডাই দঅন পড়িবো'—অনুরোধের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে ভুবন।

সকাল থেকে আকাশটা গুমোট হয়ে আছে। বৃষ্টি ঝরবে ঝরবে, কিন্তু ঝরছে না। দীনদয়াল দাওয়ায় বসে ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে যাচ্ছে। মঙ্গলীও যথানিয়মে উপস্থিত। দীনদয়ালের সঙ্গে একটু ঘন হয়ে বসে সে একবার শিক্ষার্থী আর একবার দয়াল মাস্টারের দিকে তাকাচ্ছে। আজকে তার চোখের ভাষা একটু গাঢ়, একটু মাদকতাপূর্ণ।

দীনদয়ালের মনটা আজকে খুব বেশি ভাল নেই। বার বার তার বউয়ের কথা মনে পড়ছে। বউটা ঝগড়াটে, সন্দেহপ্রবণ। কিন্তু স্বামীর প্রতি যে চরণদাসীর একটা গভীর টান আছে, সেটা অনুভব করে দীনদয়াল। বউয়ের কথা মনে হতেই নিজের ভেতর একধরনের ভাঙন টের পায় সে। চরণদাসীর অনুপস্থিতি দীনদয়ালের মনকে আজ বিক্ষিপ্ত করছে বার বার।

ছুটি দেয়ার সময়ে বিদ্যার্থীদেরকে উদ্দেশ্য করে দীনদয়াল বলে, 'হুইনচ্চনি তোঁয়ারা। অনেকের বাপ-মা দুই মাসর বেতন দে নো। তোঁয়ারার মা-বাপেরে কইও টিয়াগুন দিবারলাই।' কথাগুলো শেষ করল সে রামনারায়ণের ছেলে গুরুপদর দিকে চোখ রেখে।

টুপটাপ বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। জোরে বৃষ্টি শুরু হবার আগেই দীনদয়ালের পাঠশালা ছুটি হয়ে গেল।

রামনারায়ণের ছেলে গিয়ে তার মাকে মাস্টারের বকেয়া বেতনের কথা বলল। রামনারায়ণের বউ ভাবলো—ঠিকই তো, মাস্টার মানুষ, তারা টাকা না দিলে খাবে কি? আজকেই তার বকেয়া টাকাটা দিয়ে দেওয়া দরকার।

হাতের কাজগুলো সারতে তার আরও কিছুক্ষণ লেগে গেল। হাতটা আঁচলে মুছে টিনের বাক্সটা থেকে টাকা নিয়ে দীনদয়ালের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা দিল রামনারায়ণের বউ রাধারাণী। মাথায় একটা ছেঁড়া ছাতা ধরে কোনোরকমে দীনদয়ালের দাওয়ায় উঠে এল সে। দরজাটা বন্ধ, তবে বাইর থেকে বোঝা যাচ্ছে ভেতরে মানুষ আছে।

'মাস্টর আছ না?' বলে দরজাটা খুলতেই রাধারাণী দেখল—বিছানো একটা চাটাইয়ে মঙ্গলী চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। শাড়িটা ওপর দিকে তোলা। উদোম বুক। চোখদুটো আধবোজা। আর দীনদয়াল তার বুকের ওপর হামলে পড়ে ঘনঘন কোমর দোলাচ্ছে।

'ও মারে'—বলে রামনারায়ণের বউটি পড়ি কি মরি করে দাওয়া থেকে উঠানে. উঠান থেকে পথে বেরিয়ে এলো। তার হাত পা থরথর করে কাঁপছে। চোখে আঁধার আঁধার লাগছে। তার মাথার ওপর অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। সেদিকে খেয়াল নেই তার। মন্থর পায়ে ভিজতে ভিজতে সে বাড়িতে ফিরে গেলো।

ষোলো

সেদিন সন্ধ্যাতেই বিজন বহদ্দারের ঘরে সালিশ বসল। রামনারায়ণের স্ত্রী অনেক চেষ্টা করেছে দৃশ্যটি হজম করে ফেলতে। কিন্তু যতবারই সে ঠিক করেছে কথাটা কাউকে বলবে না, ততবারই তার বমি হয়েছে। শেষপর্যন্ত স্বামীর কাছে মুখ খুলেছে সে।

সব শুনে স্বামী শুধু বলেছে, 'কী কইলি তুই, এত বড় অপরাধ।' এই সময় মাস কয়েক আগে দীনদয়াল কর্তৃক তার ছেলে প্রহৃত হওয়ার কথাটি বেশি করে মনে পড়ল রামনারায়ণের।

তারপর যুবরাজকে ডেকে সালিশের ব্যবস্থা করেছে রামনারায়ণ। অন্যান্য সর্দারদের সঙ্গে কথাটা চালাচালিও করে নিয়েছে ইতিমধ্যে।

বিজন বহদ্দারের ঘর-উঠান মানুষে মানুষে সয়লাব। পাড়া ভেঙ্গে মানুষ জড়ো হয়েছে সেখানে। বয়স্করা ঘন হয়ে ঘরের ভেতর চাটাইয়ে বসেছে। তরুণরা একটু দূরে অবস্থান নিয়ে ফুঁসছে। নারীরা বেশ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সালিশের ওপর নজর রেখেছে।

সভার পশ্চিমদিক ঘেঁষে দীনদয়াল মাথা নিচু করে বসে আছে। অন্যদিকে নীরক্ত হয়ে বসে আছে মঙ্গলীর বাপ বলরাম। দূরে মঙ্গলীকে ঘিরে নারীদের জটলা।

বিজন বহদ্দারই প্রথমে কথাটা তুলল, 'তুই কী গইল্যা মাস্টর? আঁরার দুর্বলতার সুযোগ লই এত বড় সর্বনাশ গইল্যা।'

রামনারায়ণ রাগতস্বরে বলল, 'এত মিডা কথা কওনর সময় ইয়ান নো। আজিয়া হিতে বলরাইম্যার কুমারী মাইয়ারে নষ্ট গইজ্যে, কালিয়া আঁর মাইয়া আর তোঁয়ার বউয়র মিক্কে চোখ দিতে দেরি গইত্যো নো। হালার পোয়া বলে মাস্টর।'

'আঁই সন্ধীপত্তোন আইছি, আন্নাগোর পোলাপাইনেরে হড়াইয়্যম। আঁরার পোয়ারে পড়াইতো যাই যুবতি মাইয়ারে পড়ান শুরু গইজ্যে। পেমর পড়া, ঠাপ মারনর পড়া।' গড় গড় করে কথাগুলো বলে পূর্ণ সর্দার হাঁপিয়ে উঠল।

কামিনী সর্দার শান্তস্বরে দীনদয়ালকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোঁয়ার কিছু কওনর আছে না মাস্টর?'

'না, আঁর কিছু কওনর নাই। আঁই অপরাধী। আন্নারা যে শাস্তি দিবেন, হেই শাস্তি আঁই মাথা হাতি লমু'—বলল দীনদয়াল।

'তইলে কী গরন যায়?' সভার উদ্দেশে কথাগুলো বলল পূর্ণ বহদ্দার।

'ঢেন্ডেরি! ঢেন্ডেরিই মাস্টইয়্যার আর মঙ্গলীর আসল শাস্তি।' সভার বাইরে দাঁড়ানো মানুষের ভেতর থেকে কে যেন চিৎকার করে বলল।

'হিয়ান ছাড়া আর কোনো উপাই নাই?' মর্মাহত কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল কামিনীমোহন।

'কি উপাই থাইবো। রক্ষক ভক্ষক অইয়ে। যারে আঁরা বাপত্তোনো বেশি সন্মান দি, গুরুত্তোনো বেশি মর্যাদা দি, হিতেই আঁরার মা-মাইয়ারে লই লীলা গরের। হিতার কোনো মাফ নাই। হিতার উপযুক্ত বিচার গর।' ক্ষোভের সঙ্গে বলল রামনারায়ণ।

'আঁরা শেষ। আঁরার আশা শেষ। বিদ্বান! জাইল্যার পোয়াঅলে আবার বিদ্বান হইবো? শেষ, বিয়াগ্নিন শেষ।' নিবিড় কষ্টমেশানো কণ্ঠে কামিনী বলল।

মঙ্গলী অবিবাহিতা। কিন্তু দীনদয়াল বিয়ে করেছে। তার বউ আছে ঘরে। তাই দীনদয়ালের সঙ্গে মঙ্গলীর বিয়ে হতে পারে না। মঙ্গলীর জন্যে অন্য আরেকটি মেয়ের সংসার ভাঙা যাবে না। ঠিক হল—ভবিষ্যতে মঙ্গলীর যদি বিয়ে ঠিক হয়, তখন জেলেরা টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করবে। তবে আজকের বিচারে উভয়কে শাস্তি পেতেই হবে। সেই শাস্তির নাম ঢেন্ডেরি। আর আগামীকাল থেকে দীনদয়ালের কাছে কোনো ছেলেমেয়ে পড়তে যাবে না। তার পাঠশালা চিরতরে বন্ধ।

দীনদয়ালের মাথার চুল মাঝখান থেকে কামিয়ে দেয়া হল। মঙ্গলীর চুলের আগা বেশটুকু কেটে নেয়া হল। উভয়ের গলায় জুতার মালা পরানো হল। আর মুখমণ্ডলে লেপে দেয়া হল চুন ও কালি। দুজনকে পাশাপাশি হাঁটিয়ে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল। পেছনে পেছনে নানা বয়সী কিছু তরুণ টিন-থালা ইত্যাদি বাজিয়ে চলল। এইভাবে গোটা পাড়ায় দুজনকে হাঁটিয়ে ঢেন্ডেরি দেয়া হল।

এই ঢেন্ডেরির মধ্যদিয়ে উত্তর পতেঙ্গার জেলেসন্তানদের শিক্ষিত হওয়ার সকল স্বপ্ন-সাধ ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল।

আমারবই.কম

সতেরো

আমারবই.কম

কয়েকদিন পর দেখা গেল উত্তর পতেঙ্গার সমুদ্রকূলে চারটা তক্তার নৌকা এসে ভিড়েছে। প্রতিটি নৌকায় চার-পাঁচজন করে আরোহী। আরোহীরা মুসলমান। খোঁজ নিয়ে জানা গেল এরা মুসলমান হলেও মাছমারার কাজে দক্ষ। এরা এখানে মাছ ধরতে এসেছে, জাল বসাতে এসেছে। আরও জানা গেল, শুক্কুর ও শশিভূষণ এদেরকে সন্দ্বীপ থেকে ভাড়া করে এনেছে। গোটা মরসুম এরা এদের হয়ে সমুদ্রে জাল বসাবে, মাছ ধরবে।

জেলেপাড়ায় হৈচৈ পড়ে গেল। এতদিন সমুদ্রটা তাদেরই এক্তিয়ারে ছিল। আজকে ভাগ বসাচ্ছে শুক্কুর ও শশিভূষণ। এক অজানা আশঙ্কায় জেলেপাড়ার বুক কেঁপে উঠল।

দিন কয়েকের মধ্যে সমুদ্রকূলে মাছধরার সকল প্রকার সরঞ্জাম প্রস্তুত করল এই নবাগত মৎস্যজীবীরা। সুদিন দেখে একদিন এই চারটি নৌকা বেরিয়ে পড়ল সমুদ্রে গোঁজ পুঁততে। সঙ্গে গেল শুক্কুর। বিজন-পূর্ণর পাতায় নোঙর করল চারটি নৌকা। জোয়ার একটু ঢিলে হয়ে এলে জেলেদের জাল সমুদ্রতল থেকে জলের ওপরে ভেসে উঠল। এই সময়ে বিজন-পূর্ণর জালের সামনেই গোঁজ পুঁততে শুরু করল শুক্কুররা।

দু'পাশ থেকে বিজন-পূর্ণ চিৎকার করে উঠল, 'ইন কিইত্তা লাইগ্য শুক্কুর মিয়া? জালের সামনে দি গোঁজ গাঁইত্যা লাইগ্য। ইয়ান ঠিক নো অর। এই কাম নো গইজ্যো।'

শুক্কুর উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'বেশি কথা নো কইচ্। দইজ্যা কার বাপর না? দইজ্যা বিয়াগুনর। আঁর ইচ্ছা আঁই ইয়ান্দি জাল বোয়াইয়্যম। যিয়ান গরিত পারচ গঅর গই। আর হুন, লাআনির পোয়া ডোম অল, হুদা তোরার নো, বিয়াগ ডোমর ভাতঘর বন্ধ গরি দিয়্যম আঁরা। খেয়াল রাইস।'

এরপর জেলেরা স্তম্ভিত হয়ে দেখল বিজন-পূর্ণর জালের সামনে দিয়ে ধমাধম দশ বারোটা গোঁজ পুঁতলো চারটি নৌকার মৎস্যজীবীরা। হয়তো কাল এসে সেখানে জাল বসাবে তারা। সামনে পাতানো শুক্কুরদের জালে মাছ ঢুকবে আর জেলেদের জাল থাকবে মৎস্যশূন্য।

এক নিদারুণ হতাশা নিয়ে বিজন-পূর্ণ বাড়ি ফিরল। অল্পসময়ে শুক্কুরের কীর্তির কথা সমস্ত জেলেপাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল। জলদাসরা বলাবলি শুরু করল, 'আঁরা বাঁচি থাওনর পথ বন্ধ অই গেল গই। হুয়াই মরণ ছাড়া আর কনঅ গতি নাই।'

আমারবই.কম

রাতে বিজনের বাড়িতে সমবেত হল আপামর জেলেরা। সভায় ঠিক হল—আগামীকাল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আফজালুর রহমান চৌধুরীর কাছে যাবে তারা। তাঁর কাছে তারা এই অন্যায়ের প্রতিকার চাইবে। একমাত্র তিনিই জেলেদের এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন।

পরদিন কাকডাকা ভোরে নারীপুরুষ দল বেঁধে চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িতে গেল। চেয়ারম্যান তখনো ঘুম থেকে উঠেননি। জেলেরা তার উঠানের এখানে ওখানে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

বেশ কিছুক্ষণ পর চেয়ারম্যান বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী অইয়ে, তোঁয়ারা এইল্যা বিয়াগুনে এত ফজরত আইস্যো দে কিঅল্যায়?'

গঙ্গা দাঁড়িয়ে জেলেদের অসহায়ত্বের কথা, বেশি সুদে শুক্কুর শশিভূষণদের কাছ থেকে ঋণ নেয়ার কথা, গেলো বছর কামিনীর অপমানিত হওয়ার কথা গুছিয়ে বলল। সবশেষে যোগ করল, 'এই বছর হুজুর আঁরা জাইল্যাঅলে তারাত্তোন দাদন নো লই। আঁরা আঁরারে সাহায্য-সহযোগিতা গজ্যি। তারার স্বার্থর হানি অইয়ে। হেতল্যাই বুলি তারা আঁরার জালর সামনে দি গোঁজ গাড়ি দিএ। আঁরা ইয়ানর পতিবিধান চাই।'

'চাও, সুদ খাওনর মত গুনার কাম আর নাই। আল্লা সুদখোররে মাফ নো গরে। হিতারা যদি দাদনর কাম গরি থাকে, তইলে ভালা নো গরে। তারা গুনা গইজ্যে। কিন্তুক, তোঁয়ারা যে আবেদন লই আইস্যো, হেই ব্যাপারে আঁর তো কিছু গরনর নাই। আল্লার দইজ্যা। হিন্দু-মুসলমান-বুদ্ধ-খিরিস্টান বিয়াগুনর জাল বোয়ানর অধিকার আছে। শুক্কুর-শশিবাউ যদি জাল বোয়াইতো চা, তইলে আঁই কেএন গরি বাধা দিত্ পারি?' থেমে থেমে সাদাকালো দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন চেয়ারম্যান।

গঙ্গা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আঁরা তো জাল বোয়াইবার বিরোধিতা নো গরির। আঁরার আপত্তি—আঁরার জালর সামনে দি জাল বোয়াই আঁরার পেডত লাথি মারনর বিরুদ্ধে। আওনে আঁরারে বাঁচান।'

চেয়ারম্যান চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'আঁই কেএন গরি বাঁচাইয়্যম। জাল বোয়ানর অধিকার বিয়াগুনর আছে। কইজ্যা নো গরি যার যার মতো জাল বোয়াও গই।'

আবদুল গফুর জেলেদের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন। খুব বেশি সচ্ছল নয় সে। দু'চার কানি জমি আছে। জেলেদের জন্যে সর্বদা সে নিজের মধ্যে ভালবাসা অনুভব করে। জেলেরাও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্যে তাকে পছন্দ করে। জেলেদের এই বিপদের দিনে আবদুল গফুরও এসেছে তাদের সঙ্গে। চেয়ারম্যানের এই কথায় মাথার টুপি ঠিক করতে করতে বলল,'আওনর কথাত্ ফাঁক আছে চেয়ারম্যান সাব।'

'হিবা কন্? গফুর না? কি ফাঁক?' শান্ত থাকার চেষ্টা করতে করতে আবদুল গফুর চেয়ারম্যান জিজ্ঞেস করলেন।

'দইজ্যা আল্লার ঠিক আছে। কিন্তুক সামনে দি জাল বোয়াই দিলে মাছ গল্লইবো কেএন গরি?' রাগকে দমন করতে করতে বলল গফুর।

'জোয়ারর সমত শুক্কুর মিয়াত্তোন গল্লইলে, ভাডাত জাইল্যার জালত গল্লইব।' নির্বিকারভাবে বললেন চেয়ারম্যান।

আবদুল গফুর কণ্ঠ উঁচিয়ে জেলেদের উদ্দেশে বলল,'বুইঝ্যো নি তোঁয়ারা?'

জেলেরা বুঝল, চেয়ারম্যান তাদের সাহায্য করবেন না। হয়তো তারা আসার আগে শুক্কুর-শশিভূষণ চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে গেছে।

অসহায় জলপুত্ররা মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে নিজেদের আবাসস্থলের দিকে রওয়ানা দিল।

সন্ধ্যেয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেলেরা গঙ্গাদের উঠানে জড়ো হল। এলো বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা, এলো মধ্যবয়সীরা, এলো তরুণরা। এলো বহুদাবলা, এলো শাউল্যালা, এলো বিয়ারিরা, আর গামছাকাঁধে এলো গোপাল জলদাস।

গঙ্গা সবাইকে উদ্দেশ্য করে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'যার কাছত্তোন সাহায্য পাওনর কথা, হেই চেয়ারম্যান যখন সাহায্য নো গইল্যো, তখন আঁরার অধিকার আঁরাত্তোন আদায় গরি লওন পড়িবো। অন্যায়ের মূল হাঁড়ি দেওন পড়িবো। এই জাইল্যাপাড়াত যত নৌকা আছে, কালিয়া বিয়াগ্নিন পাতাত যাইবো। কোনোভাবেই শুক্কুইজ্যা শইশ্যারে আঁরার সামনে জাল বোয়াইতো দিতাম নো। আঁরা পতিরোধ গইজ্যম। তোঁয়ারা কি কও?'

সমবেত জনতা গর্জন করে উঠল, 'পতিরোধ গইজ্যম। জান দি পতিরোধ গইজ্যম। আঁরা কালিয়া বিয়ানল্যাই অপেক্ষা গরির।'

প্রচণ্ড ক্ষোভ আর উত্তেজনা নিয়ে জলপুত্ররা যার যার ঘরে ফিরে গেল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। মেঠোপথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে একটি ছায়ামূর্তি। শুক্কুরের বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়াল সে মূর্তিটা। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাপাস্বরে ডাকল,'শুক্কুর হুজুর বাড়িত আছ না? শুক্কুর হুজুর।'

শুক্কুর মিয়া রাতের খাবার শেষ করে ঘুমোবার আয়োজন করছিল। বউয়ের বানিয়ে দেয়া পান তখনো মুখে। বাইরে চাপাস্বরে তার নাম উচ্চারিত হতে শুনে শুক্কুর অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ক'ন্, হিবা কনে ডাইক্‌তা লাইগ্য?'

'আঁই, আঁই গোয়াইল্যা, জাইল্যাপাড়ার গোয়াইল্যা।'

শুক্কুর দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গোপালের সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি অইয়ে? এত রাতিয়া কি খবর লই আইস্যাচ্?'

'খবর সাংঘাতিক। কালিয়া তোঁয়ারার সর্বনাশ অইবো। জাইল্যা অলে ক্ষেপি গেইয়ে গই। গঙ্গা বিয়াগনেরে জাগাই তুইল্যে। একজোট গইজ্যে। কালিয়া গঙ্গাইয়া বিয়াগ জাইল্যারে লই দইজ্যার মাঝে তোঁয়ারার উঅর ঝাঁপাই পড়িবো।' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেল গোপাল।

'কী কঅচ্ তুইঃ' ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল শুক্কুর।

'হ, কালিয়া তোঁয়ারারে পানির মইধ্যে চুবাই মারিবো। সাবধান। যিয়ান গরিবা আজিয়া রাতিয়াই গর। গঙ্গা জাইল্যা অলর নেতা। হেই নেতার ডাকে হিতারা আজিয়া পরান দিতে প্রস্তুত'—গোপাল বলল।

'আইচ্ছা। ঘরত্ যা। চাই কী গরন যা।' গোপালকে বিদায় করে শুক্কুর মিয়া ঘরে ঢুকল। গায়ে একটা চাদর জড়াতে জড়াতে বউকে বলল,'আঁই ইক্কিনি বাইরে যাইর। আইতে আইতে দেরি অইবো।' বলেই দরজা খুলে দ্রুতবেগে সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আমারবই.কম

'অ পুত, আঁত্তোন বঅর ডর লাগের। তুই এই ঝামেলাত কিঅল্যাই জড়ালি?' গঙ্গার হাতটা চেপে ধরে ভুবন কথাগুলো বলল। জেলেরা যার যার ঘরে ফিরে গেলে গঙ্গা উঠান ছেড়ে দাওয়ায় উঠে আসার পর ভুবন কথাগুলো বলল।

'মা, তুঁই নো ডরাইও। জাইল্যা অল বঅর অসহায়। হিতারারে পথ দেখাইন্যা কেউ নাই। আঁরে হিতারা ভালবাসে। আঁই হেই ভালবাসার পতিদান দিতাম নো না মা?' বলল গঙ্গা।

'হেই পতিদানের জ্বালা যেএন খুব বেশি নো অয় অপুত।' গঙ্গার প্রশ্নের উত্তরে বলল ভুবন।

দৈনন্দিন জীবনে জলদাসরা হাঁটু অবধি ঝুলানো ধুতি পরে। ধুতির রঙ সাদা হলেও বহু ব্যবহারে সে ধুতি ধূসর হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ সময় তারা উদোম থাকে। কাঁধে সর্বদা ঝুলানো থাকে আধময়লা একটা গামছা। শীতে বা বর্ষায় অথবা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে তারা গায়ে দেয় ফতুয়া বা হাফ-হাতা গেঞ্জি।

কেউ কেউ শার্টও পরে। কিন্তু জাল বাইতে যাওয়ার সময় তারা পরনের ধুতিটা পাগড়ির মতো মাথায় জড়িয়ে নেয়। সেই পাগড়িতে থাকে বিড়ির বান্ডেল ও দেশলাই। আর পরিধান করে কোনোরকমে আব্রুঢাকা একখানা গামছা, গায়ে দেয় ওমওয়ালা ছেঁড়া কোনো জামা। এই জামা ও পাগড়িই তাদেরকে ঝড়জল ও ঠাণ্ডার হাত থেকে কিছুটা রক্ষা করে।

আজ বাইরে ঝড়ো-বাতাস। আকাশে পাগলা মেঘ। এই বুঝি বৃষ্টি নামবে। রাতের খাওয়া শেষ করে গঙ্গা টাউঙ্গাজাল বাইতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। পরনে সেই চিরাচরিত পোশাক। গঙ্গা বিড়ি খায় না। মায়ের কাছে শুনেছে তার বাপ চন্দ্রমণিও কোনো বিড়ি-তামাক খেতো না। মায়ের কাছে এই কথা শুনে শুনে ছোটবেলা থেকে বিড়ি-তামাকের প্রতি তারও একধরনের বিরাগ জন্মেছে। গলাচিপা দুইজ্যাটা পিঠে ঝুলিয়ে টাউঙ্গাজালটা কাঁধে নিয়ে রওয়ানা দেয়ার আগে উচ্চস্বরে মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মা, আই টাউঙ্গাজাল লই যাইর।'

ভুবন পাকঘরে বউয়ের সঙ্গে হাঁড়ি-পাতিল গোছাতে ব্যস্ত ছিল। গঙ্গার ডাক শুনে উঠানে বেরিয়ে এল। ছেলের বেশভূষা দেখে বলল, 'আকাশর অবস্থা ভালা নো। যেকোনো সমত আঁধার গরি ঝর পড়া শুরু অইবো। আজিয়া জাল লই নো যাইচ্ অপুত।'

'কালিয়া বিয়ানবেলা দইজ্যাত যাইয়্যম। আরা জাইল্যা অলর এখন বঅর দুদ্দিন। সুদখোর অলে আরার পেডত্ লাথি মাইজ্যে। ইয়ানর পতিবিধান নো গইল্যে জাইল্যা অলে মাড়ির লগে মিশি যাইবো গই। যাউক মা, যিয়ান কইতাম চাইলাম—কালিয়া হিতারার লগে দইজ্যাত গেলে আইতে আইতে বিয়াল অই যাইবো গই। গত দুইদিন জাল লই নো যাই। কালিয়াঅ যাইত পাইত্যাম নো। আজিয়া যাই মা'—বলল গঙ্গা।

ভুবন চিন্তিতমুখে বলল, 'আজিয়া কেএন জানি আঁর মনত্ ভালা নো লাগের। মন নো চাআর তুই জাল লই যা।'

গঙ্গা হাসতে হাসতে বলল, 'তুঁই নো ডরাইও মা। ভগবান আছে। আর তুঁই তো আঁর লগে লগে ছাইয়া অই ঘুর। আঁর কোনো বিপদ অইতো নো। ঝর পড়িবো রাতিয়া। গুইল্দা মাছর মৌসুম। খালত্ বিলত্ বাইয়্যম। ত্বরাত্বরি চলি আইস্যম। যাই মা।'

'যাইতে নাই, দুর্গা দুর্গা'—কপালে দুই হাত ঠেকিয়ে চোখ নিমীলিত করে পেছন থেকে উচ্চারণ করল ভুবন।

ঝড়ো হাওয়ার বিপুল বিক্রমে সকালটা এলোমেলো। বাইরে বাউন্ডুলে সন্ত্রাসী বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। ভুবনের বারান্দার নড়বড়ে দরজাটা সামান্য খোলা। সেই খোলা অংশ দিয়ে ভুবন বাইরে তাকিয়ে আছে। তার চোখে গভীর উৎকণ্ঠা। সকাল হয়ে

গেছে, গঙ্গা ফিরেনি। টাউঙ্গাজাল বাইতে গেলে সাধারণত ভোরের আজানের আশপাশ সময়ে গঙ্গা বাড়ি ফিরে। আজ এত বেলা হয়ে গেছে, গঙ্গা ফিরেনি। অজানা আশঙ্কায় মায়ের বুক দুরুদুরু করে ওঠে। বউটি কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ভুবন টের পায়নি। কানের পাশে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে ভুবন বউয়ের দিকে ফিরল। দেখল—সুমিত্রার মুখ মলিন। সন্তানধারণের কারণে এমনিতেই তার চেহারা পাণ্ডুর হয়ে গেছে। তার ওপর দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ায় সেই পাণ্ডুরতার রঙ গভীরতর হয়েছে। একসময়ে অনেকটা স্বগতকণ্ঠে ভুবন বলল, 'বিয়ান অইদে বউত্‌খন অই গেইয়ে। আইজো গঙ্গা নো ফিরিল। বউ, আঁরে জুঁইরগান্ দওতো, আঁই কদ্দুর পথ উজাই চাই আই।'

বউ মাথালটি এনে দিলে তা মাথায় দিয়ে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ভুবন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বৃষ্টির ঝাপটা থেকে বাঁচার জন্যে বউটি দরজা ভেজিয়ে দিল।

যেতে যেতে কামিনীর দেখা পেল ভুবন। খালপাড়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে ঘরে ফিরছিল কামিনী। জিজ্ঞেস করল, 'এই রইম্যা ঝড়র মইধ্যে কডে যাইতা লাইগ্যো গঙ্গার মা?'

ভুবন বলল, 'কালিয়া রাতিয়া গঙ্গা টাউঙ্গাজাল লই গেইয়ে। আইজো নো ফিরে। চাইতাম যাইদ্যে।'

'কী কও তুঁই! এত বেলা অই গেইয়ে আইজো নো ফিরে?' উৎকণ্ঠা মিশ্রিত কণ্ঠে কামিনীমোহন বলল। 'চল, আঁইও যাই তোঁয়ার লগে।'

দুজনে পাড়া ছাড়িয়ে পথে নামল। মেটে পথ, পিচ্ছিল। উদ্বিগ্নতা নিয়ে বেশ দূরে চলে এলো তারা। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখল, একজন জেলে টাউঙ্গাজাল কাঁধে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে। তার চলা এলোমেলো, কিন্তু দ্রুত। কাছে এলে চেনা গেল—সে বংশী।

সামনে ভুবন ও কামিনীকে দেখে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল বংশী, 'কাকিমারে, সব শেষ, বিয়াগ্নিন শেষ; সর্বনাশ, আঁয়ার সর্বনাশ অই গেইয়ে গই।'

কামিনী কিছু বলার আগেই ভুবন দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কি অইয়ে বংশী। খোলসা গরি বেএক ভাঙ্গি ক।'

'গঙ্গা মরি গেইয়ে গই। গঙ্গারে মারি ফেলাইয়ে। আঁই শুক্কুইজ্যার খামারর ঢাগর খালত দেই আস্যি'—বংশীর কম্পিত কণ্ঠ চিরে এই কথাগুলো বেরিয়ে এলো।

হুড়মুড় করে ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল ভুবন।

প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ার পুরুষরা, নারীরা দলে দলে ছুটল শুক্কুইজ্যার খামারের দিকে। শুধু গেল না ভুবন ও সুমিত্রা। ভুবন পাথর, সুমিত্রা অক্ষম। ভুবন নীরবে উঠানে কাদার মধ্যে বসে রইলো, সুমিত্রা নিম্নস্বরে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসালো।

জেলেরা দেখল—শুক্কুরের খামারটি খালের যে-পাড়ে, সে-পাড়ের পানির কোল ঘেঁষে গঙ্গার দেহ বুক পর্যন্ত কাদামাটিতে পোতা। জিহ্বা অর্ধেক বেরিয়ে পড়েছে। চোখে চরম ভয়। গঙ্গার গলার চারদিকে গভীর কালো দাগ। আশপাশে অনেক পায়ের এলোমেলো ছাপ।

খালের দু'পাড়ে মানুষ থৈ থৈ। সবাই স্তব্ধ। ভিড় থেকে গোপাল হঠাৎ বলে উঠল, 'ভূতে মাইজ্যে দে।'

জয়ন্তকে কেউ কোনোদিন গালি দিতে শোনেনি। আজ সেই জয়ন্ত ক্ষেপে উঠল, 'কোন্ চোদানির পোয়া কলি দে ভূতে মাইজ্যে? মানুষ-ভূতে মাইজ্যে আঁরার গঙ্গারে। মানুষ-ভূতে মাইজ্যে।' বলতে বলতে গঙ্গার পাশে কাদায় বসে পড়ল জয়ন্ত। তার কণ্ঠে কান্নার হু হু আওয়াজ।

উভয় পাড় থেকে শত শত নরনারীর আওয়াজ উঠল, 'হ, মানুষ-ভূতে মাইজ্যে। আঁরার গঙ্গারে মানুষ-ভূতে মাইজ্যে।'

অল্পক্ষণের মধ্যে দেখা গেল শুক্কুরের খামারটি দাউদাউ করে জ্বলছে। জেলেরা দলবেঁধে সেই খামারে আগুন দিয়েছে।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ থেকে মেঘও অনেকটা সরে গেছে। মেঘভাঙা রোদে জেলেপাড়াটি ভেসে যাচ্ছে।

গঙ্গার মৃত দেহকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। উঠানের উঁচু শুকনো মতন জায়গা একটা পাটিতে উত্তর-শিয়রি করে শুইয়ে দেয়া হয়েছে গঙ্গার শরীরটাকে। মৃতদেহের পায়ের কাছে কাদায় মাখামাখি হয়ে গঙ্গার বউ চিৎকার করে বিলাপ করছে, 'ভাইরে, অ ভাইরে, আরে অকূলত্ ভাসাইদি কডে গেলা গইরে ভাই ভাই।'

মৃতদেহের পাশে বসে পানিভর্তি বালতিতে গামছা চুবিয়ে গঙ্গার গায়ের কাদামাটি মুছে যাচ্ছে জয়ন্ত। তার দু'চোখ থেকে জলের ধারা অবিরাম ঝরে পড়ছে।

গঙ্গার শিয়রের কাছে জল-কাদায় বসে আছে ভুবনেশ্বরী—স্তব্ধ, নিথর, পাথরের মত। দৃষ্টি তার উঠানে-জড়ো হওয়া অসংখ্য মানুষকে ছাড়িয়ে দূরে—বহুদূরে প্রসারিত। সে-দৃষ্টিতে প্রতীক্ষার উজ্জ্বল আলো—অনাগত জলপুত্র বনমালীর জন্যে।